পক্ষিরাজ

সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মিত্র কার্তিক '৮৭ নভেম্বর '৮০

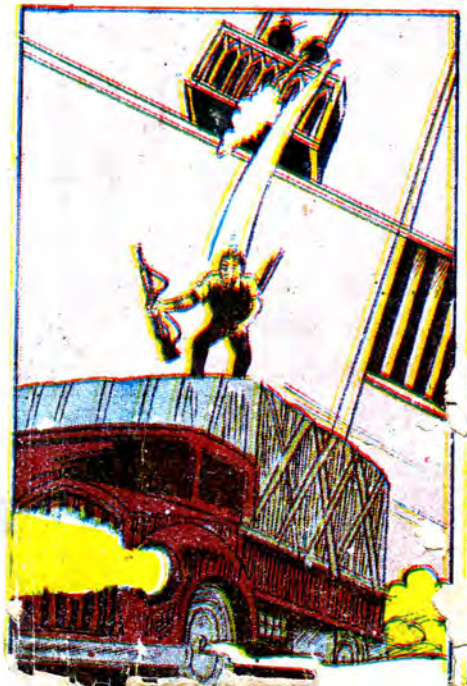

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আতিথানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

জনপ্রিয় প্রকাশনী

৩৮বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট; কলিকাতা ৭০০০০৯

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও সহকারী শিক্ষক বন্ধুগণ,

আশা করি কুশলে আছেন। আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

১৯৮০ সালের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (দুই প্রস্থ) আগামী ৯। ১১। ৮০ হতে সরবরাহ পাবেন। ১৯৮১ সালের নূতন গৃহপাঠ্য বইয়ের তালিকা ও নমুনা বই ঐ সঙ্গে পাওয়া যাবে। ১৯৮১তে সিলেবাস কোন অদলবদল হচ্ছে না। বছরে আমাদের ৪ বার (১ম সাময়িকী (এপ্রিল), অর্দ্ধ বাৎসরিক (জুন), ২য় সাময়িকী (আগষ্ট) (বার্ষিক নভেম্বর) প্রশ্নপত্র বের হয়।

এবছর কাগজের দাম ও মুদ্রণ খরচ অতি মাত্রায় বেড়ে গেলেও আমার প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্র এবং বই নির্বিবাদে সরবরাহ পাবেন। প্রশ্নপত্র ও বই এর দাম বাড়ছে না। গত বৎসরের ন্যায় রাখা হয়েছে। মরশুমের মাঝখানে মূল্য বাড়বে না। বই এর ছাপা মূল্যই ঠিক। বই এর কমিশন ৩০%।

বিশেষ কথা—জেলা, সার্কেল, অঞ্চল প্রভৃতি শিক্ষক সমিতির সম্পাদকগণকে আমার অনুরোধ তারা প্রশ্নপত্র ক্রয় করার এবং পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করার পূর্বাহ্নে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। পাঠ্যতালিকার ব্যাপারে সমিতির সহিত পুরাপুরি সহযোগিতা নিঃসঙ্কোচে করতে আমার প্রতিষ্ঠান আগ্রহশীল।

প্রশ্নপত্রের রেট—২য় (বড়) ইতিহাস সহ, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী প্রতি সেট টা ১·৪০, ১ম শ্রেণী ৭০ পঃ, শিশুশ্রেণী ৫০ পঃ, ৯ম শ্রেণীর কেবল ইংরাজী ৪০ পঃ। ২য় শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ১·২০ টাকা, কমিশন টাকায় ৬০ পয়সা। ৫ম শ্রেণীর প্রতি সেট নেট ৬০ পঃ। নামছাপা স্কুল প্রতি ৪ টাকা।

আপনার এলাকায় বিক্রেতার নাম ঠিক করিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব।

বিঃ দ্রঃ হাতে বা ডাকে কমিশন বাদে ৩৫ টাকার উপর প্রশ্নপত্র নিলে নামীদামী লেখকদের লেখায় ভরপুর ৪০০ পাতার বোর্ড বাঁধাই পক্ষিরাজ, ৪৫ টাকার উপর প্রশ্নপত্র নিলে একটি English to Bengali Pocket Dictionary ৯০০ পাতার বই, ৬০ টাকার উপর প্রশ্নপত্র নিলে একটি English to Bengali (বড়) Dictionary ১৫০০ পাতার বই উপহার হিসাবে পাবেন। এই ক্ষেত্রে ডাক ব্যয় আপনার এবং অর্দ্ধেক টাকা M. O. যোগে অগ্রিম পাঠাতেই হবে। ইতি—তাং ৬। ১১ ৮০

নিবেদক—শ্রী প্রদীপ মৌলিক

১৯৮১ সালের সাহায্যকারী গৃহপাঠ্য পুস্তকের তালিকা (শিশু থেকে চতুর্থ শ্রেণীর) আগামী সংখ্যায়।

প্রাইমারী বাংলা সমস্ত স্কিমের খাতাপত্র পাইবেন। কমিশন ১০%।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা
নং ৫৫২/১ (১৩) টি. বি. সি. তারিখ ২০/৫/৮০

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮৭, নভেম্বর '৮০

চিত্রে গল্প :	ডাকু ও প্রোঃ ইকনমিস্ট/শৈল চক্রবর্তী	২৫
	দুরন্ত দুরাশা/দিলীপ দাস	১
ছড়া ও কবিতা :	পক্ষিরাজের বার-মাসি/প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪
	কিসের জন্য কি/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	৫
	বুকুর পিশেমশাই/উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৫
বিশেষ রচনা :	আজব শখ/অমলেন্দু নাথ ঘটক	১৬
	সংবাদ-বিচিত্রা/বিশ্বামিত্র	২৩
	উদ্ভিদজগতের আজব খবর/গৌরী দেবী	১২
বিশেষ বিভাগ :	তোমাদের কৃতিত্ব আমাদের অভিনন্দন	১৬
ধারাবাহিক উপন্যাস :	সবুজ পাতা লাল ধুলো/নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১৭
গল্প :	বীর পুরুষ/শক্তিপদ রাজগুরু	৭
	বুধুয়া বাবার উপহার/রোথিন সিংহ	২০
	মৃত্যু এলো পৃথিবীতে/সুধীন্দ্র সরকার	১৩
কার্টুন :	পিকলু/পরিচয় গুপ্ত	১৫
ম্যাজিক :	এস ম্যাজিক শেখাই/পি. সি. সরকার জুনিয়র	২৪
ধাঁধা :	ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর	২৯
প্রতিযোগিতা :	চৈত্রী সাহিত্য প্রতিযোগিতার ফলাফল	৬/৩২
	ভেবে ভেবে সমাধান ও উত্তর	৩৩
	বলো তো ?	৩২
খেলা :	ছেলেবেলার গল্প/শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
তোমাদের পাতা :	আগামীকালের লেখকদের আসর	৩১
অলংকরণ :	দেবাশিস দেব	

ছোটদের
মনের মতন অভিনব
মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : প্রেমেন্দ্র মিত্র

দাম : এক টাকা

বিক্রয় কেন্দ্র : সাক্‌সেস্‌ পাবলিশিং হাউস, ১ বিধান সরণী, কলকাতা ৭৩
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

পক্ষিরাজের-বারমাসী

পক্ষিরাজ ! ও পক্ষিরাজ !
শুভ্র খুশির শরৎ গেল চলে,
তোমায় কেমন ঝাপসা দেখি কেন ?
মিহি সুতোর উড়ুনি কার
তোমা ওপর ছড়িয়ে আছে যেন !

মিহি সুতোর উড়ুনি নয়,
এই ধরারই যেন ঘুমের ঘোর
কুহেলিকার জালের মত
শূন্যে জড়ায় সূক্ষ্ম স্বপন-ডোর।

আজকে তুমি নও একেলা।
চেয়ে দেখো কত তোমার সাথী !
লক্ষ গৃহ চূড়ায় জ্বলে
আকাশ প্রদীপ, ছড়িয়ে করুণ ভাতি।

করুণ কেন ?
করুণ হাসিকান্না মেশা—
চারটি দিনের উৎসবে আর শোকে।
দেবী আসেন ফুটিয়ে হাসি
যান কাঁদিয়ে আবার বিসর্জনে
অশ্রুধারা বইয়ে সবার চোখে।

আবার তবু এসো দেবী।
সারা বছর থাকব আশায় চেয়ে।
যে স্বর্গের-ই হওনা দেবী
চারটি দিনের তরে
বারে-বারে হোয়ো ধরার মেয়ে।

বুকুর পিশেমশাই

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পিশেমশাই আছেন বুকুর
তেনার নাকি বিশটা পুকুর
সোনায় মোড়া বেতের লাঠি
বাহাত্তরে-ও দাঁতের পাটি
মাঠ কোঠাতে আঠাশটা ঘর
গোটা ষাটেক মুনিষ, চাকর,
তাঁর রাধুনীর রান্না খেয়ে
কে এক সাহেব ঘেমে নেয়ে
বলে ছিল, ও মাই গড্ !
খাস বিলিতি বিরাট লর্ড !
সেই রান্না তোফা, আহা,……
বিল্লু বল্লে,— মিথ্যে ডাহা
তিন কুলে কই পিসি তোদের ?
এবার থামা হয়েছে ঢের !

কিসের জন্য কি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নাক নিয়ে কি নাকাল
কানের জন্য কাঙাল ?
পেট নিয়ে হও পেটুক
যা ঘটে তা ঘটুক।
ক্ষুধার জন্য খাদ্য
খাওয়ার আগে হাত ধো।
জামার জন্য আদুর গা
পায়ের জন্য পাদুকা।
চোখের জন্য চশমা
একটু কাছে বস মা।
মেঘের জন্য আকাশ
গাছের পাতায় বাতাস।
পুজোর জন্য আশ্বিন
একটু জোরে শ্বাস নিন।
আসছে ফুলের গন্ধ
লেখাপড়া বন্ধ।

॥ চৈতী সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

পুতুল মেয়ে

রাণী দত্ত

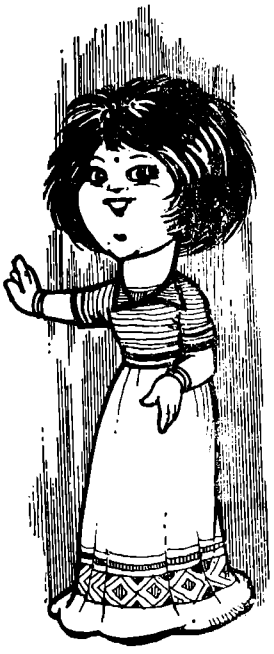

সকাল বেলায় ফুলের মেলায়
ছুটছে তুতুল আনমনে,
খেয়াল খুশির চতুর্দোলায়
দোলে খেলে যায় প্রাঙ্গণে।
হলদে দুপুর বাজিয়ে নূপুর
লুকিয়ে থাকে শরবনে,
বনের ধারে নদীর পারে
সুষ্যি ওঠে চনমনে।
কাপাস তুলো পালকগুলো,
ফড়িং নাচে ফনফনে,
টাপুর টুপুর তালের দুপুর—
রোদ ঝাঁঝালো গনগনে।
ফুলের মেয়ে উঠল গেয়ে
শিবের গীতে ধান ভেনে,
চীনের পুতুল বসল খেতে
ডিশ সাজিয়ে চাউমেনে।

॥ চৈতী সাহিত্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া ॥

ইকির-মিকির

দেবপ্রতিম সেনগুপ্ত

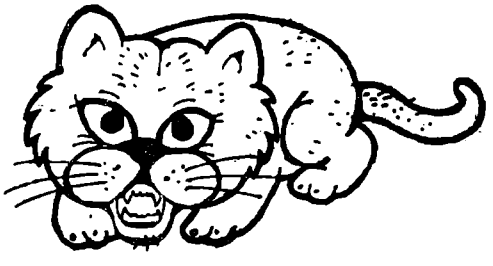

ইকির মিকির, খাওয়ার ফিকির,
ডাকছে কুকুর—
বেউ-ঘেউ।
শুনে খুশি ভুলোর পুষি
উঠল ডেকে মেউ মেউ।

বীরপুরুষ

শক্তিপদ রাজগুরু

পাঁচুদা আসার পর থেকেই আমাদের দুর্ভোগ শুরু হল। ঘরে বাইরে গঞ্জনা-ভর্ৎসনা এসবেরও কামাই নেই। ক'দিনেই প্রেস্টিজ প্যাংচার হবার যোগাড় হয়ে গেল। বাবা বলেন পাঁচুর মত ছেলেকে দেখে শেখ, আদর্শ ছেলে বুঝলি।

গদাই বলে, পটলাকে ওয়ার্ণিং দিয়ে দে সমীর ওর দাদাটিরে সামলাই রাখুক, নাহলে কলকাতাইয়া মালটিরে বোলড্ আউট কইরা প্যাভেলিয়ানে ফিরাইয়া দিমু। গদাইরে চেনে না।

গদাই এ জীবনে কভু পূর্ব বঙ্গ দর্শন করেনি। কিন্তু ওই ভাষাতেই কথা বলে প্রমাণ করতে চায় যে সে-ই পূর্ব-বঙ্গেরই ভূতপূর্ব সন্তান। আর মেজাজটাও তেমনি।

অবশ্য মেজাজ তিরিক্ষি হবারই কথা। বেশ ছিলাম আমরা রূপপুরের শান্ত পরিবেশে স্কুল, ক্লাব-নাটকের অভিনয়-ফুটবল কমপিটিশন নিয়ে। পাঁচুদা পটলার পিসীমার ছেলে, দয়া করে কলকাতা থেকে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে এসে এহেন অজ পাড়াগাঁ রূপপুরকে যেন ধন্য করেছেন। আর আমাদের মুখে নুড়ো জেবলে মুখ কালো করে দিয়েছেন জনসমক্ষে। সেদিন পটলাদের বাড়ি গেছি পটলা আমি গদাই আর ফটিক, ক্লাবের অনুষ্ঠান হবে, ছোট একটা নাটিকা করছি আমরা। আরও দুচারজন।

ছেলে মেয়ের গান টান হবে। গ্রামের অনেককে নেমতন্ন করা হয়েছে। ক্লাবের অস্তিত্ব ওই পটলাদের বাড়ির বাইরের ঘরে। দুটো আলমারিতে কিছু বইপত্র যোগাড় করে কিশোর পাঠাগার এর কাজও শুরু করেছি। এবার ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু ডোনেশান সংগ্রহ করে বইপত্র কেনা হবে তাই অনুষ্ঠানটা সুন্দর করতেই হবে।

পটলাকে ডাকতে গিয়ে ওর ঘরের তক্তপোষে হঠাৎ দুটো জুতো সমেত শ্রীচরণ দেখে দাঁড়ালাম। গুণ গুণ সুর উঠছে আর জুতো দুটো তালে তালে নড়ছে। আমাদের হাঁক ডাকে জুতো সমেত ঠ্যাং দুটো বিছানায় গুটিয়ে উঠে বসলো একটি তরুণ।

মাথার চুলগুলো যেন কাকের বাসা, দাড়ি গোঁফ জুলপি সব একাকার হয়ে গেছে, মুখে সিগ্রেট, সিগ্রেট সমেত মুখটা চেপে শুধোয়—হু ইউ ?

কে আমি কিবা পরিচয় দেব। একথা রূপপুরে এদ্দিন ধরে জন্মেছি বসবাস করছি এ প্রশ্ন কেউ করেনি। গদাইও হতচকিয়ে গেছে। সেইই উলটে রিটার্ণ কিক্ করার মত প্রশ্নটা ওর দিকেই ছুঁড়ে দেয়।

—হু ইউ ?

এমন সময় পটলাকে দেখলাম চা, একটা বড় প্লেটে

বিস্কুট, দুটো ডিমসেদ্ধ, কলা আর সন্দেশ নিয়ে ঢুকছে। প্লেটটা ওর সামনে নামিয়ে দিয়ে আমাদের বলে—তোরা এসেছিস ভালোই হয়েছে। এই আমার পাঁচুদা, কলকাতার পিসীমার ছেলে। ক'দিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে এসেছে। একেবারে অল রাউন্ডার।

আমরা দেখছি পাঁচুদাকে।

কলকাতার সম্বন্ধে মোহ একটা চিরকালই আছে। সেই স্বপ্ননগরীর রাজপুত্তুর যেন পাঁচুদা। তবে ওই রাউন্ড-ফাউন্ড যা বলেছে পাঁচুদা তেমন রাউন্ড তো নয়। হাত পা লম্বা লম্বা-বরং বেশী লম্বা। পা দুটো গোল কিনা দেখছি।

পটলা বলে—না মানে চৌকস, লেখাপড়া—খেলাধুলো শিকার-গানবাজনা-অভিনয়, এসবে একেবারে চৌকস। আর পাঁচুদা এই আমার বন্ধু, সমীর গদাই ফটিক।

পাঁচুদা ততক্ষণে গবাগব বিস্কুট কলা গিলছে। ডিমে একটা কামড় দিয়ে মন্তব্য করে ফ্রেন্ডর ?···চামচে বল।

ফ্রেন্ড আর চামচা দুটোতে অনেক ফারাক তা জানি, তবে কলকাতায় বোধহয় ও দুটো একই জিনিস। গদাই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কথাটা ওর ভালো লাগেনি।

পাঁচুদা চায়ের কাপটা নামিয়ে একটা ঢেঁকুর তুলে বলে—তাহলে চল। তোদের ভিলেজটা একটু চক্কর দিয়ে আসি।

আমি স্মরণ করাই হ্যাঁরে পটলা সামনে ফ্যাংশন—একবার রিহার্সাল দিবি না ?

পটলা বলে—ওসব হবে। পাঁচুদাকে পেয়ে গেছি। ওসব পোজ পশ্চার সব দেখিয়ে দেবে। কলকাতার বাঘা বাঘা ডিরেকটররা ওর খুব চেনা জানা—

পাঁচুদা শুধোয়—ফ্যাংশন! কিসের ফ্যাংশন ? লিভার ফ্যাংশন নাকি ? আরে বাবা সব হয়ে যাবে। এ্যাইসা পোজটোজ বাৎলে দোব, দেখবি ক্যামন এফেক্ট হয়। চল—ব্রেকফাস্টটা হেভি হয়ে গেছে। একটু ঘুরে আসি।

পাঁচুদা চলেছে আগে আগে—পিছনে আমরা। চকচকে প্যান্ট, রঙ্গীণ ছক্কর বক্কর আঁকা জামা, পাঁচুদাকে আমাদের স্কুল, বোর্ডিং, খেলার মাঠ, শিবমন্দির, হাটতলা দেখাতে বের হয়েছি। আমাদের গাঁয়ের মধ্যে দর্শণীয় বস্তু ওগুলোই। পাঁচুদা ইস্কুল দেখে দুহাত কোমরে দিয়ে হাসতে থাকে। বলে—এটা কি স্কুল রে ? এই এইটুন লম্বা একতলা বাড়ি আর বাকী খড়ের ঘর। তা তোরা কি চ্যাটাই এ বসে পড়িস ? তাই এমনি বুদ্ধি তোদের! আমাদের স্কুল এর দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যাবে। তিনতলা ইয়া বাড়ি। ওই তোদের হোস্টেল ? পুঃ—এতো গরু থাকার গোয়াল ঘর রে ? ওইটা সায়েন্স ব্লক ?

সবই যেন তার কাছে অর্থহীন। পাঁচুদার কথায় পটলা তবু শোনায়—সমীর ফটিক ওরা ফার্স্ট বয়, গতবার ও আমাদের স্কুলের তিনটে ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে। দুটো স্টার মার্ক ছিল।

—থাম তো তুই। পাঁচুদা জানায় আমাদের স্কুলের সবকটারই ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। স্টার ফার তো ডজন খানেক থাকে।

গদাই বলে—তোমারও কি স্টার ছিল তাহলে পাঁচুদা ?

পাঁচুদা ওর কথায় বলে—স্টার পাব না বলেই তো হেডস্যার এলাউ করেননি। বলেন—পাশ করাতো ইজি ম্যাটার রে। স্টার পেতে হবে। এনাদার ইয়ার থেকে পাকা হয়ে বের হবি।

তাই পাঁচুদা এখন সেই পাকাপোক্ত হবার জন্যই বসে আছে। পটলাও সায় দেয়—পাঁচুদাও ব্রিলিয়েন্ট ছেলে রে ?

হাটতলায় এসে পাঁচুদা বলে—এবার হাসালি পটলা ? এই তোদের হাটতলা ?

আমি জানাই গাঁয়ের হাট তো এমনিই হয় পাঁচুদা! কলকাতার বাজারের সঙ্গে তুলনা করলে চলে ?

পাঁচুদা বিজ্ঞের মত বলে—কারেক্ট।

বাতাসে নাকটা বার দুয়েক শোঁক শোঁক করে বলে—গুড স্মেল রে ? চলতো দেখি ওদিকে কি ফ্রাই ট্রাই হচ্ছে।

এবার পটলার সঞ্চিত ধনে হাত পড়েছে। কেবল-রামের তেলেভাজার দোকানে আলুর চপ, বেগুনী, পেঁয়াজি ভাজা হচ্ছে। বটতলায় বাঁশের মাচার উপর বসে শ্রীচরণ দোলাতে দোলাতে পাঁচুদা এক ঠোঙ্গা আলুর চপ, বেগুনী একাই সাবাড় করে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলে—নট ব্যাড।

আমরা ভেবেছিলাম কিছু ভাগও দেবে, কিন্তু একাই পুরোটা সাবাড় করে দেয় সে। পুঁজিও নেই তাই একটা করে আলুর চপ চুষে পাঁচুদার সেবা করেই উঠে এলাম।

গদাই গজরায়—ওটা কি রাক্ষস রে!

পাঁচুদা হঠাৎ ধুলো মাখা জুতোটার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। গ্রামের ধুলোয় হেঁটেছে। এবার জুতো মোজার ওই চেহারা দেখে বলে ফটিককে—এ্যাই রুমালটা নে, ঝাড় দিকি জুতোটা! ইস পটলা এত ধুলো এখানে। কই—সাফ্ করে দে!

চমকে উঠে। ফটিক নিরীহ গোছের ছেলে। রুমালটা নিয়ে সে ওর জুতো ঝাড়তে শুরু করেছে। গদাই গুম হয়ে দেখছে। পাঁচুদা বলে চলে এবার। ন্যাশ্টি ভিলেজ

রে তোদের।

রাগে গজরাচ্ছি।

পটলাকেই এবার জবাব দেব। কিন্তু ওর কথায় রাগটা একটু কমে যায়। পটলা বলে কাল ভোরে আসবি। বরোয়ার বিলে শিকার করতে যাবো। অনেক বেলেহাঁস নামছে।

বেলেহাঁস অনেক আসে এসময় ওই জায়গায়। অনেক দিনের সাধ একবার বন্দুক পেলে চলে যাবো ওদিকে। দুচার জন যায় ও। আর সেবার গুপীকাকা ক'টা বেলে হাঁস মেরে আমাদের দুটো দিয়েছিল, সেই মাংসের স্বাদ এখনও জিভে লেগে আছে। তাই শিকারের কথায় বলি চল গদাই। একটা দিন ঘুরে আসি। যদি কিছু মেলে।

পটলা বলে মিলবে না মানে? পাঁচুদা একজন গ্রেট হান্টার! পাঁচুদা বলে ওঠে এখানে কি শিকার করবো বল? সেবার তরাইএর ফরেস্টে গেছলাম—হ্যাঁ ফরেস্ট বটে! আর যা চাও বাঘ, হাতি, বাইসন, গণ্ডার···সব আছে। আর পাখীর তো রাজ্য।

তবে ওসব ছোটখাটো জিনিস মারিনা বড় একটা। রোগা হাতি একটা মেরেছিলাম—

অবাক হয়ে দেখছি ওই সিটকে পাঁচুদা! ওর ওজনের দুহাজার মণের চেয়ে ও বেশী ওজনের একটা প্রাণীকে কি করে মারলো সেটা ভাবতে অবাক হই।

পটল বলে—এখানে হাতি তো নেই, দাও দুচারটা বেলেহাঁস মেরে, জমিয়ে ফিস্টি করি।

পাঁচুদা যেন দয়া করে আমাদের মাংস খাওয়াবার জন্যই বের হয়েছে। পরণে বেলবটস প্যান্ট লটপট করছে। আর সেইরকম রঙ্গীণ স্লাউজের কাপড়ের জামা, মাথায় সাদা টুপি, মুখে সিগ্রেট। হান্টারের এই পোশাক দেখে অবাক হই—একি রে? শিকার করতে যাচ্ছে না সিনেমা দেখতে যাচ্ছে কলকাতায় তোর পাঁচুদা?

পাঁচুদা শুনে বলে কি যে আমার বিয়ে তার দুপায়ে আলতা? চল তো—পাখী মারতে যাবো তার আবার হ্যান্টিং ড্রেস পরতে হবে? নে বন্দুকটা ঘাড়ে নে। এ্যাই তুই নে ওয়াটার বটল, আর গদাই তুমি এই টিফিন বাস্কেটটা নাও দিকি!

তোড়জোড় এর ত্রুটি নেই। টিফিন বাস্কেট ভর্তি খাবার, ওয়াটার বটলএ জল, ছাতা, সবই নিয়ে পরের ঘাড়ে বন্দুক চাপিয়ে পাঁচুদা তুড়ি দিয়ে হিন্দি সিনেমার গান গাইতে গাইতে চলেছে জংপেশ লাল নীল কমলা রংএর সোয়েটার চাপিয়ে।

গদাই বলে ওঠে—শিকার কি হবে রে?

শীতের ভোর। গ্রাম তখনও জাগেনি, প্রান্তে গ্রামের ঘনবন জঙ্গল বিরাট ধ্বংসস্তূপটার গাছে পাতায় কুয়াসা জড়ানো। ওই বিরাট প্রাসাদএর ধ্বংসস্তূপটা আমাদের কাছে রহস্যময় ঠেকে আজও। কোন কালে ওটা নাকি এক সামন্ত রাজার গড় ছিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় ওদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়, ওই স্তূপকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে।

ওখানে কেউ যায় না। কেউ বলে ভূতের রাজ্য, তবু অনেকে আশপাশে নাকি কিছু সোনার মোহরও পেয়েছে। বিজ্ঞের মত পাঁচুদা বলে কারেক্ট। ওটা ছিল প্রথমে বৌদ্ধ বিহার, ওদের পুঁথিপত্তর, সব ছিল, আর সোনা দানাও। তারপর কোন সামন্ত রাজা সেটাকে দখল করে তার প্রাসাদ বানায়। হিস্ট্রি পড়িসনি বুঝবি কি করে?

গদাই কি ভেবে বলে গুপ্তধনও ওখানে আছে। আর একটু খুঁজলে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

পাঁচুদা বলে—সিওর। কিছু পুঁথিপত্তরও পাওয়া যেতে পারে। একবার ট্রাই করবো।

চমকে উঠি—ওখানে যাবে?

দু একবার গেছি ওখানে। চারিদিকে অনেকখানি ঘন জঙ্গল, মধ্যিখানে ওই বিরাট বাড়িগুলোর কিছু কিছু ধ্বসে পড়েছে।

সাপখোপের আস্তানা। তাছাড়া দিন দুপুরে নাকি ওখানে সেবার গতি কামার ভূত দেখেছিল। ভূত আবার একটা দুটো নয়—বেশ কয়েকটাই নাকি ওখানে থাকে। হাডু-ডু খেলে মাঝে মাঝে। গতি তাই না দেখে বেহুঁস হয়ে গেছল।

কথাটা বলতে পাঁচুদা হা হা করে হেসে উঠে বলে—কাওয়ার্ড কোথাকার! ঠিক আছে একদিন ওখানেই এক্সপিডিশন্ চালানো যাবে।

গদাই আমাকে ইশারায় চুপ করতে ইঙ্গিত করে বলে—তাই চলুন পাঁচুদা। আপনার সাহসে যদি ওখানে কিছু উদ্ধার করা যায় সত্যিই নাম হবে ক্লাবের।

পাঁচুদা বলে—অলরাইট! নাউ বয়েজ—লেট আস্ মুভ! বেশ মাইল তিনেক রাস্তা ধরে গিয়ে নেমে যেতে হবে বিলের দিকে। পটল চলেছে পাঁচুদার পিছু পিছু, আলপথ দুদিকে ধান ক্ষেত, শিশিরে ঘাসগুলো ভিজে পিছল হয়ে উঠেছে, ধানের মঞ্জরীগুলো নুইয়ে পড়ে। পাঁচুদা এবার একটু বিপদে পড়েছে। পা হড়কাচ্ছে, সামনে কাশবন ওরই মাঝ দিয়ে যেতে হবে, জলের কাছে। সেখানে

দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলা এলাকায় পাখীরা ডুবছে উঠছে সাঁতার দিচ্ছে। ওদের চিক্ চিক্ পিঁক পাঁক শব্দও শোনা যায়।

সাবধানী পাখী ওরা। সামান্য শব্দ পেলেই উড়ে যাবে। আমরাও সাবধান হয়ে এগোচ্ছি। ধানক্ষেতের পর একটু জল মাঠগড়ানী জল গিয়ে বিলে পড়ছে।

পাঁচুদা ইশারায় ওই গদাইকে ডেকে ওর ঘাড়েই চেপে বসে। ওমা জলটা পার করে দিতে হবে কাঁধে করে। আমাদের মধ্যে গদাইই শক্ত পোক্ত, তাই ওর ঘাড়ে চেপে ওদিকের নলবনের মধ্য দিয়ে গুড়ি মেরে যাবে সে। পাঁচুদার হাতে বন্দুক—গদাই গজ গজ করে—ভ্যালা শিকারী এয়েছেন।

কিন্তু উপায় নেই। ওকে ঘাড়ে করে নামতে হয়েছে জলে—এঁটেল মাটি। পা নড়বড় করছে—ওদিকে উঠতে গিয়ে একেবারে পা হড়কে দুজনেই পড়েছে জলকাদায় নদীতে প্রতিমা বিসর্জনের মত।

ছপাং!

আর পাখীগুলোও টের পেয়ে একনিমেষে আকাশ ছেয়ে কলরব করে উঠে উড়ে চলেছে, পাঁচুদাও তৈরি ছিল না—আচমকা কাদায় চিৎপাত হয়ে পড়েছে আর ওই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডবল ব্যারেল বন্দুকের ঘোড়া তোলা ছিল—দুটো গুলিই বের হয়ে যায় প্রচন্ড শব্দে।

জলে দাপাচ্ছে পাঁচুদা—কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠেছে গদাই। পাঁচুদাকেও ধরাধরি করে তুলেছি। গর্জাচ্ছে পাঁচুদা—আই শ্যাল কিল্ ইউ স্যুট ইউ! কিন্তু ওই আচমকা ছুটে যাওয়া ছড়রাগুলো গিয়ে উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকেই লেগেছে আর দুটো বেলেহাঁস ছিটকে পড়েছে নলবনে -ধানক্ষেতে।

দৌড়ে গিয়ে পাখী দুটোকে ধরে ফেলেছি। পাঁচুদাও পাখী দুটোকে দেখে এবার বলে, তবু পড়ে পড়েই ফ্লাইং সট্ করলাম। দুটো মেরেছি। যদি এসব না হতো দেখতিস ক'টা মারতাম! সব বাঁদরের দল। এমন শিকার গুলোকেই হারালাম!

গদাই গুম হয়ে থাকে। পটলা বলে—

তা সত্যিই! তুমি বলেই তবু দুটোকে মেরেছো পাঁচুদা!

দ্যাখ! নাহলে যা ফিল্ট হতো!

আপশোষ করতে থাকি। ওই দুটো পাখী নিয়েই ফিরলাম। অবশ্যি পাঁচুদার দামী প্যান্ট, জামা, জুতো তখন কাদায় কাদা। পাখীর বাসার মত চুলগুলোয় এঁটেল মাটি শুকিয়ে জটা জটা হয়ে কোন স্বামীজির মত দেখাচ্ছে।

গদাই বলে—শিকারী না কচু। হাত থান বন্দুক আছড়াই পইড়া গুলি ছুটছে, নিজেই মরতাম বরাতজোর তাই পাখপাখালির উপর দিই গেছে। ওরে দ্যাখাইমু!

অবশ্য রাতে ফিল্টটা জমেছে ভালোই। দুটো বেলে হাঁস আর মুরগী সবই ছিল। পটলের ছোট কাকাও বেলেহাঁসের হাড় চুষতে চুষতে বলে—হ্যাঁ! পাঁচু সত্যিই শিকারী! সরেস মাংস হে।

পাঁচুদা বলে—এনাদার ডে যাবো। তবে পটলা ওই গদাই না ফদাইকে বলে দে ও যেন না যায়। ওর জন্যেই কতগুলো পাখী মিস্ করলাম! ইস্!

পাঁচুদা সমানে পোজ নিয়ে চলেছে।

পাঁচুদা বলে—এবার ভাবছি তোদের ওই গড়জঙ্গলের ইতিহাস একটু ঘাঁটতে হবে। তার আগে ওখানে যেতে চাই!

আমি আমতা আমতা করি ওখানে সহজে কেউ যায় না পাঁচুদা! পাঁচুদা শীর্ণ বুক চিতিয়ে বলে—তাই ওখানে যাবো। তোরাতো কাওয়ার্ড! পটলা—ওদের বলে দে, যে কাওয়ার্ড সে যেন ওখানে না যায়। নট দ্যাট গদাই!

গদাই গুম হয়ে খেয়ে চলেছে।

পাঁচুদাই প্ল্যানটা করে! আমি—ফটিক ভীরু বদনাম কিনতে চাই না। তাই রাজী হই—যাবো!

গদাই বলে—ওই প্যাঁচকলে আমি নাই।

পাঁচুদাই আয়োজন করতে বলে চট, দড়ি, ছুরি এসব নিতে হবে! আর কিছু চক্।

যেন রীতিমত এক এ্যাডভেঞ্চারেই নামছে পাঁচুদা!

পটলা বলে একটা কুঠারও নিতে হবে, সাবল-ও, মানে যদি গুপ্তধনের সন্ধান পাই?

পাঁচুদাও মাথা নাড়ে—তা নেওয়া ভালো। আর সবকিছু আমাকে দিয়ে চেক্ আপ্ করিয়ে নেবে। আই এ্যাম দি লিডার।

মাথা নাড়ি আমরা।

গদাই বলে যা তোরা লীডারের সাথে, আমি এতে নাই।

গদাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, সেইই যাবে না শুনে ঘাবড়ে যাই। পাঁচুদা অভয় দেয়—নো ফিয়ার, আই এ্যাম দেয়ার বয়েজ।

বিকেলেই বের হয়েছি ওই জঙ্গলের দিকে। ভয় ভয় করছে, ঘন শিমুল-শেওড়া-যজ্ঞি ডুমুর গাছের ছায়া

নেমেছে, বাঁশবনে অন্ধকার জমে। সব পথটা ঘাসে ঢেকে গেছে। আমরা চলেছি ওই বনের মধ্যে। মনে মনে রাম-নাম জপছি। রাম নাম করলে ভূত নাকি সরে যায়।

পাঁচুদাও মাঝখানে—পটল চলেছে আগে আগে। পোড়োবাড়ির সরু পথ দিয়ে একটু উঠান মত জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ইটগুলো তখনও কোথাও কোথাও দোতলার সমান উঁচু হয়ে আছে, পলেস্তারা নেই—শেওলা পড়েছে। দেওয়াল ছেয়ে বটের গাছ উঠেছে—ফেটে গেছে প্রাসাদের অবশিষ্ট অংশগুলো!

কুইক মার্চ। পাঁচুদা গর্জন করে পিছন থেকে।

কিন্তু সরু ওই দরজার ফাঁক দিয়ে চাইতে গিয়ে সরে এলাম।

পাঁচুদা বলে—কাওয়ার্ড এর দল, লেট মি গো।

দাঁড়িগুলো বেঁধে এনেছি, অন্ধকার ছাদ বিপজ্জনক ভাবে রয়েছে, ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে আরও ঘরের নিশানা।

অজানা ভয়ে যেন গলা শুকিয়ে আসছে।

পাঁচুদা বলল—ভয় কিসের?

কিন্তু ভয়টা যে তারই বেশী—পিছনে হাঁটছে সে—সেটা বুঝে নিয়েই বলি আজ না হয়, এখান অবধি থাক।

পাঁচুদা গর্জে ওঠে—নেভার, আই শ্যাল গো বয়েজ, কাম্ অন। ভয় কিসের।

হঠাৎ গালে কে যেন চড় কসিয়েছে চমকে উঠি। পাঁচুদাও ঘাবড়ে গেছে। হেসে ফেলি ভূতের চড় নয় চামচিকের লাথি।

পাঁচুদা ধাতস্থ হয়ে ধমকায় ওসব ভূত ফুত আমি মানি না। ফরোয়ার্ড মার্চ।

হঠাৎ অন্ধকার কাঁপিয়ে বিকট শব্দে কে হেসে ওঠে! অন্ধকারে ওই শব্দটা শুদ্ধ বাড়িটাকে যেন কাঁপিয়ে তোলে। গা হাত পা ঝিম ঝিম করছে। পটলা টর্চ এর আলো ফেলতে চীৎকার করে উঠি। বিকট লম্বা একটা মূর্তি ছাদে মাথা ঠেকছে, চোখ দুটো জ্বলছে। আর লম্বা বাঁশের মত হাত দুটো নেড়ে বিকট শব্দে হেসে চলেছে।

পালাবার ক্ষমতা নেই। পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। পাঁচুদাকেই ভরসা করে জড়িয়ে ধরেছি। পরক্ষণেই মনেহয় মাটিতে আছড়ে পড়বো আর ভূতটা এসে গলা টিপে শেষ রক্তবিন্দুটুকু চুষে খেয়ে শেষ করে দেবে সবক'টাকে।

পাঁচুদা তার আগেই আমার হাতের বাঁধন ফসকে একটা কাঠের মত ধপাস করে মেজেতে আছড়ে পড়েছে।

—চীৎকার করে পটল বু বু বু উ।

পাঁচুদা ক'কাচ্ছে আর ভূতও তত হাসছে হা হা শব্দে।

হঠাৎ হাসি থেমে যায়। সাদা কাপড়ের বাথারির ফ্রেমের লম্বা খাঁচাটা পড়ে যায়, ভূতের মাথা নয়, খড়ি সিন্দুর দিয়ে মুখচোখ আঁকা বড় মালসাটা কাঠির আগা থেকে নামিয়ে ভূতের কাঠামো থেকে বের হয়ে আসে গদাই-চরণ।

চমকে উঠি—তুই!

গদাই বলে—তোগোর বীরপুরুষ ওই লীডারের হাল্ খান্ দ্যাখ আগে। ওরে তুইলা লইয়া চল। জ্ঞান ফিরতি দে, পরে কমু।

—পাঁচুদাও চোখ মেলেছে। এবার আসল ভূতের স্বরূপটা দেখে চুপ করে যায়। গদাইও এবার নবাবী ষ্টাইলে বলে পটলা, ওই তোর কলকাতাইয়া বীরপুরুষরে জিগা, নকল ভূত কই খাই এই, গড় জঙ্গলের আসল খান্ দেখতি চায় নাকি? তালি যেতে ক' ওরে।

পাঁচুদা ততক্ষণে উঠে বসেছে। ওয়াটার বটলের জলে ওর চেতনা ফিরাতে হয়েছে, ধুলো কাদায় মুখ মাথা ভর্তি। শীতে কাঁপছে পাঁচুদা।

চুপ করে বের হয়ে এল। গদাই বলে কি রে বাক্য হইরা গেছে নাকি ওর?

ননসেন্স্। পাঁচুদা গজরায়।

তার পরের দিনই পাঁচুদা কলকাতায় ফিরে গেছে। রূপগাঁ নাকি একটা বাজে জায়গা—এ মন্তব্য প্রকাশ্যেই করে গেছে অবশ্য গদাই এর আড়ালে।

গদাই গজরায় ওগোর কথা ছাড়ান দে। ও এ্যাকখান ভুষিমাল বুঝছস? রূপপুরের ছোট পরিবেশে আবার শান্তি নামে।

বড়াই

এক শিকারী কুকুর একদিন এক সিংহের পিছু ধাওয়া করল। কিন্তু সিংহ যেই পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল অমনি কুকুরটা ভয় পেয়ে বিপরীত মুখে ছুটতে শুরু করল।

সিংহ-ভাগ

একদিন এক গাধা ও এক সিংহ শিকারে বের হল। অনেকক্ষণ জঙ্গলে ঘুরে তারা বেশ কিছু পশু শিকার করল। এবারে সিংহ সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করে গাধাকে বলল, দ্যাখ, আমি হচ্ছি পশুদের রাজা। কাজেই শিকারের সিংহভাগ আমার প্রাপ্য। তাছাড়া তোমার সমান ভাগীদার হিসেবে দ্বিতীয় ভাগটাও আমি নিলাম। এবারে তৃতীয় ভাগের কথা বলি, স্বেচ্ছায় যদি তুমি ওটা ছেড়ে না দাও তাহলে তোমার সামনে বহু বিপদ।

উদ্ভিদজগতের আজব খবর

গৌরী দেবী

"সেঞ্চুরী প্ল্যান্ট" গাছে প্রতি ৭ বা ৮ বৎসর অন্তর একবার ফুল হয়।

* * * *

একটা বড় MAPLE গাছের পাতার সংখ্যা প্রায় ৪৫,০০০। যদি পাতাগুলো পর পর মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তবে এক একর জমি ঢেকে যাবে।

* * * *

হ্যামটন্ ফোর্টের আঙুর গাছটিই বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় আঙুর গাছ। এর গোড়াটা প্রায় ২ মিটার মোটা, আর এর ডালপালা প্রায় ৩৭ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। প্রতি বৎসর গাছটিতে প্রায় ২৪০ কিলোগ্রাম আঙুর জন্মায়।

* * * *

নাইজিয়ার SERENDIPITY BERRYর ফল চিনির চেয়ে ১৫০০ গুণ বেশী মিষ্টি।

* * * *

সমগ্র উদ্ভিদ জগতের মধ্যে মানুষ ৩০০০ জাতকে খাদ্য হিসাবে কাজে লাগাতে পেরেছে, আর এর মধ্যে মাত্র ১৫০ রকম জাতকে নিয়ে চাষ-আবাদ করে।

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ গাছ হচ্ছে সাইবেরিয়ান্ লার্চ। প্রতি ১০০টি গাছের মধ্যে ৯টি হচ্ছে সাইবেরিয়ান্ লার্চ।

* * * *

কোন কোন বীজের পরমায়ু অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ। যেমন কানাডার আরটিক্ লুপিনের বীজ।

১৯১৪ সালে পাওয়া কিছু বীজকে ১৯৬৬ সালে অংকুরিত করা হয়েছিল। কারও কারও মতে আসলে ঐ বীজগুলি প্রায় ১০,০০০ বৎসর আগেকার।

* * * *

সবচেয়ে প্রাচীন সব্জী হচ্ছে BROAD BEAN। ফলের মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে আঙুর (৪০০০ খৃঃ পূঃ)। GRAPE FRUIT আবিষ্কৃত হয় ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে। PEAR (AVOCADO)র স্বাদ মানুষ প্রথম পায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। চিলি থেকে সভ্য মানুষ প্রথম আলু আনে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে। টম্যাটো আসে মেক্সিকো থেকে প্রথম ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে।

ধবল বা শ্বেতীর চিকিৎসা

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা

সাদা দাগ দুরারোগ্য নয়। যথাযথ চিকিৎসা হলে যেকোন অসুখের মত এ রোগও সেরে যায়। বহু বছরের গবেষণায় সাদা দাগ (শ্বেতী) সারাতে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। এই ওষুধ এতই শক্তিশালী যে একবার ব্যবহার করার পরেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে। আপনি যদি বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে দেখুন। রোগের বিবরণ পাঠিয়ে বিনামূল্যে এক প্যাকেট ওষুধ ও রোগী পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ করুন।

বহু সহস্র রোগীর ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষিত আমাদের এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

Kabiraj Satish Chandra

Sri Ayurvedic Pharmacy (PB) P.O. Katri Sarai (Gaya)

মৃত্যু এলো পৃথিবীতে

সুধীন্দ্র সরকার

জন্ম হলেই তো মানুষ মরে। মানুষ যে অমর নয় একথা আর কে না জানে? কিন্তু চিরকাল কি এরকমটা ছিল? না, তা মোটেই নয়। ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন—তখন তারা মরত না। কোনদিনই না। একবার জন্মালে চিরকালই তারা বেঁচে থাকত। ছোট থেকে বড়। বড় থেকে বুড়ো। তারপর অতিবুড়ো। অতিবুড়ো বয়সে তারা চলা ফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলত। খেতে পারত না। শরীরে কোন জোর পেত না। তবুও বেঁচে থাকত তারা।

এখন তাহলে মানুষ মরে কেন?

হ্যাঁ সেই গল্পই বলছি। একটা কাঠবিড়ালীর গল্প। সেই কাঠবিড়ালীটা কি করে মানুষের মৃত্যুর কারণ হল—সেই গল্প।

অনেক অনেকদিন আগে বনজঙ্গলে ভরা এই পৃথিবীতে একটা কাঠবিড়ালী মনের সুখে বাস করত। পাইন গাছের একটা উঁচু ডালে ছিল তার বাসা। সারাদিন এ ডাল থেকে ও ডালে, এ গাছ থেকে ও গাছে ছুটোছুটি করত। কখনো আবার লেজে ভর দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকত। দেখত কেমন করে ডানামেলে পাখিরা ওড়ে নীল আকাশের বুকে।

একদিনকার কথা। সেদিন আকাশ ছেয়ে এলো কালো মেঘে। গুড়-গুড়, গুড়-গুড় শব্দে মেঘেরা জড়ো হতে লাগল নীল আকাশের বুকে।

কাঠবিড়ালী আকাশের দিকে তাকাল। দেখল, কালো কালো মেঘগুলো যেন পাইনগাছের মাথাতেই বাসা বাঁধতে আসছে। দেখতে দেখতে নীল আকাশটা একসময় রঙ পাল্টালো। নীল রঙ হারিয়ে হয়ে গেল মিশমিশে কালো।

গুম-গুম, গুড়ুম-গুড়ুম।

বুকটা কেঁপে উঠল কাঠবিড়ালীর। মেঘের ডাক শুনে আকাশের দিকে চাইতেই ভয় পেয়ে গেল খুব।

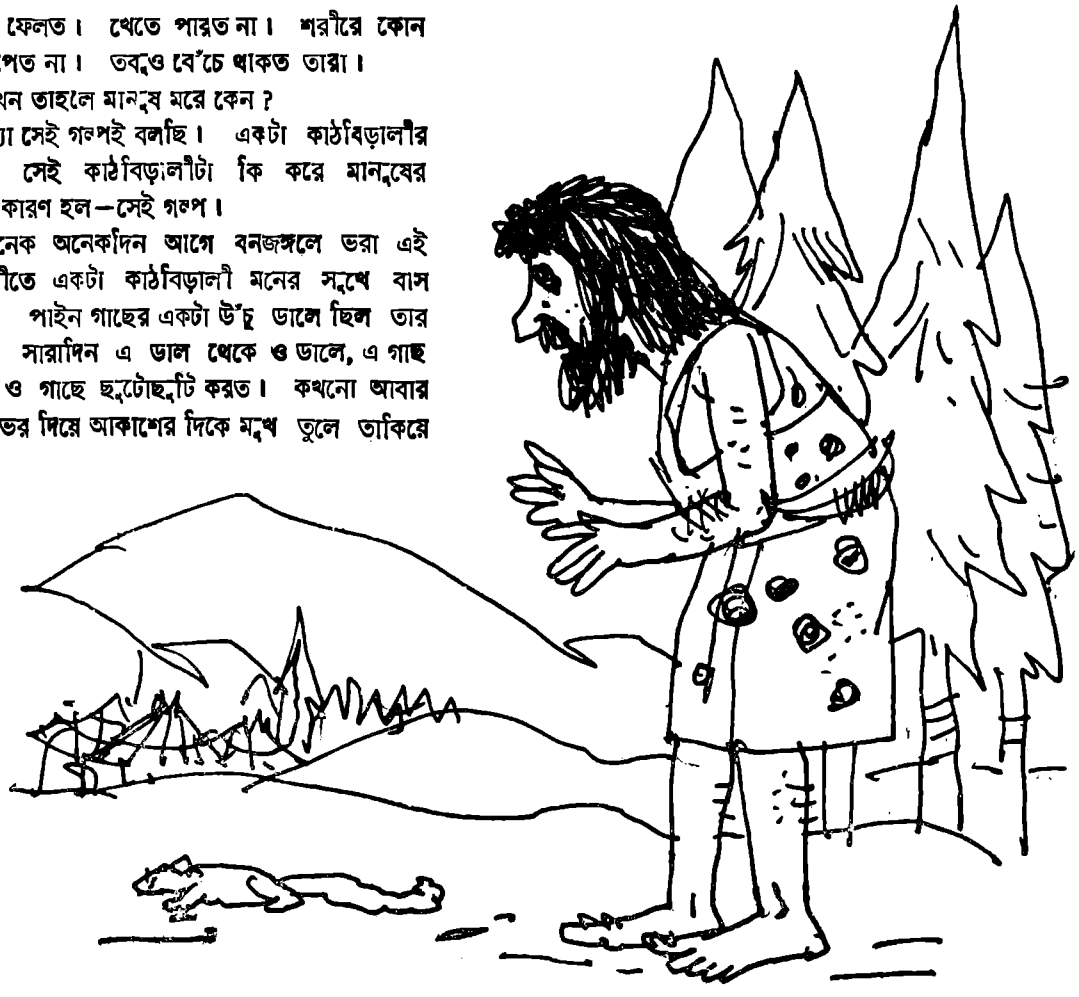

কালো আকাশের বুক চিরে সোঁ সোঁ করে নেমে আসছিল একটা ঈগল পাখি। মেঘের ডাক শুনে পাখিটাও হয়ত ভয় পেয়েছিল খুব।

ঈগলকে ঐভাবে নামতে দেখে কাঠবিড়ালী কাঁপতে শুরু করল ভয়ে। একে আকাশে মেঘের ডাক, তার ওপরে ঈগলের ধারালো নখ। ভয়ে কাঠবিড়ালী ছুটে পালাতে গিয়ে পড়ে গেল—পা ফস্কে। উঁচু ডাল থেকে একেবারে মাটিতে। মারা গেল কাঠবিড়ালী। একটুও নড়ল না। ডাকলেও না।

ঠিক সেই সময়ে পাইনগাছের নীচ দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখনকার দিনের একজন আদিম মানুষ। সব্বাই তাকে খুব মেনে চলত। কেননা, অন্যসব মানুষের চেয়ে তার বুদ্ধিটা ছিল একটু বেশি। কেউ কোন বিপদে পড়লে ও এগিয়ে আসত সবার আগে। যার জন্যেই ওকে ডাকা হতো বন্ধু নামে। বন্ধুর বয়স ছিল প্রায় পঁচিশ সতেরো বছর। ওর থেকে যারা বয়সে বড় ছিল—ওর দাদা, বাবা কিংবা কাকারা, তারাও কিন্তু ওর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করত না।

বন্ধু যখন পাইন গাছের নীচে এল। ও দেখতে পেল কাঠবিড়ালীর প্রাণহীন দেহ। প্রথমটা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, মরলো কি করে? মানুষ তো কোনদিন মরে না। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষ অথর্ব হয়ে যায় সত্যি। কিন্তু প্রাণ তো ঠিক থাকে? অথচ কাঠবিড়ালীর বুক ধুক পুক করছে না। হাত পা স্থির। সবকিছু কেমন যেন থেমে গেছে।

ব্যাপারটা কি? এইসব ভাবতে ভাবতে বন্ধু মরা কাঠবিড়ালীটা নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

বাড়ি ফিরে সকলকে কাঠবিড়ালীটা দেখাল। পৃথিবীর যত মানুষ ছিল সব্বাই কাঠবিড়ালীকে দেখল। অবাক হল। এমনটি তো তারা কোনদিন দেখেনি?

প্রত্যেকে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে লাগল—এটা কেমন করে হল? কাঠবিড়ালী মরল কি করে? আমরা তো মরিনা? কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেল সবাই। পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ বন্ধুও আজ হার মানল। সে কাউকে কোন সঠিক জবাব দিতে পারল না। মৃত্যু যে ওর কাছেও অচেনা! বন্ধু তখন কি আর করে। এতগুলো লোক সবাই যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, তখন একটা কিছু ত করতে হবে। অন্য কোন উপায় না দেখে, বন্ধু আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল—ভগবান, এখানে একজন মানুষ মরে গেছে। আপনারা একটুনি দেখে যান। বন্ধুর সাথে গলা মিলিয়ে অন্য মানুষরাও ঐ একই কথা বলে উঠল।

আকাশে তখন ছিল চন্দ্র আর নক্ষত্র।

চন্দ্র মানুষদের মুখে মৃত্যুর খবর শুনে কেঁদে ফেললেন। নক্ষত্ররা বাদ গেল না। কান্না জুড়ে দিল।

হায়রে! তাদের সাধের মানুষ মরতে শুরু করেছে!

চন্দ্র ও নক্ষত্রের দেখাদেখি মানুষ আর পশুপাখিদেরও জল নামল চোখে। একটু পরে সবার কান্নাকাটি শেষ হলে চন্দ্র বন্ধুকে ডেকে বললেন—দেখি তো কোন মানুষটা মারা গেছে।

বন্ধু মরা কাঠবিড়ালিটা দেখাতেই চন্দ্র খুব রেগে গেলেন। তার নীল চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল—বোকারাম! ওটা কি মানুষ?

—যাইহোক ও মরল কেন? বন্ধু জিজ্ঞেস করল।

—ওরা ওরকম মরে। চন্দ্র বললেন।

—আমরা কেন মরি না?

—মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ তাই তারা মরে না। চন্দ্র বললেন—মানুষ যদি মারা যায়, তাহলে পৃথিবী বাঁচবে কি করে? পৃথিবীকে রক্ষা করার ভার তো মানুষেরই।

—তা হোক! এখানে মানুষ ছাড়াও আরো অনেকে আছে। তারাও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে!

বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে চন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। নক্ষত্ররাও চন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে মৃদু গুঞ্জন উঠল মানুষের দলে।

তিনি তখন গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কি সত্যি সত্যি মরতে চাও?

নিশ্চয়ই! পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একসাথে চিৎকার করে উঠল—অতি বুড়ো বয়েসে আমাদের জীবন অসহ্য লাগে। খেতে পারি না। চলতে পারি না। কষ্ট ভীষণ বাড়ে। তখন আর একদণ্ডও বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না।

চন্দ্র বললেন—তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ঐ মরা কাঠবিড়ালীটার মাংস সবাই মিলে ভাগ করে খাও। পাকা ফল যেমন বোঁটা থেকে টুপ করে খসে পড়ে। তেমনি তোমরাও বুড়ো হলে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। কিছু জানতেও পারবে না।

চন্দ্রের কথামত বন্ধু কাঠবিড়ালীর মাংস পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিল। আর শেষ টুকরোটা নিজে খেল…

সেই দিনের পর থেকেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বুড়ো হলেই মারা যায়। অমর আর কেউ থাকে না। মৃত্যুকে পৃথিবীতে এনে বন্ধু সেদিন কতবড় বন্ধুর মত কাজ করেছিল সেকথা নিশ্চই তোমাদের বলতে হবে না।*

* আসামের রূপকথা

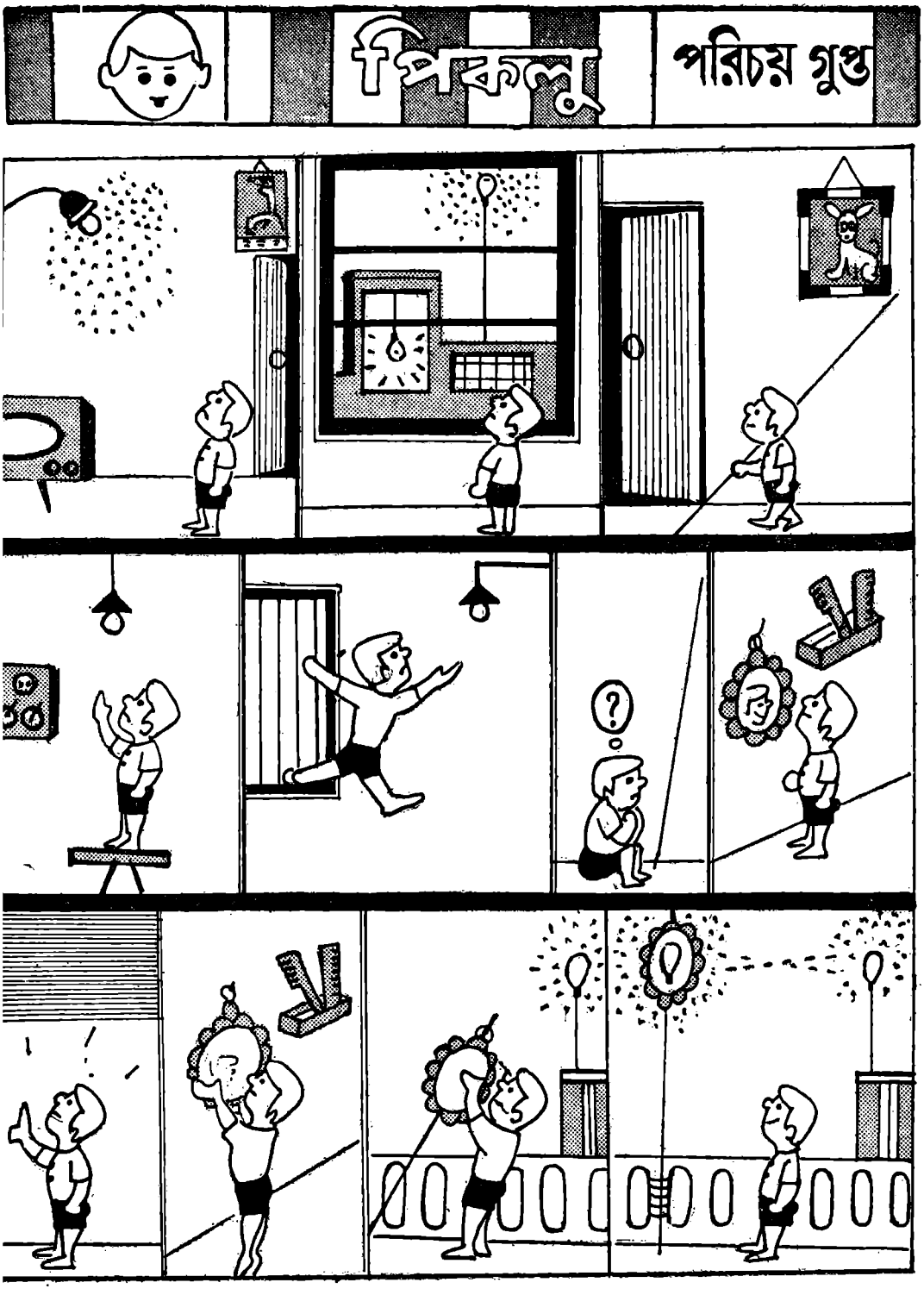
পিকলু
পরিচয় গুপ্ত

তোমাদের কৃতিত্ব আমাদের অভিনন্দন

সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের বালিকা বিভাগের দুই কৃতী ছাত্রী কুমারী চন্দ্রিমা দে ও কুমারী রক্তিমা দে গতবছর বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে যথাক্রমে দশম ও পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

লেখাপড়া ছাড়াও চন্দ্রিমার সঙ্গীতে ও খেলাধুলায় কৃতিত্ব এবং রক্তিমার সাহিত্য ও সঙ্গীতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য আমরা আনন্দিত।

* * *

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ইন্দুলাল সাহার পুত্র দেবাশিস সাহা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোট ৮৪৫ নম্বর পেয়ে, উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে সেরা ছাত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। দেবাশিসের ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ভবিষ্যতে।

লেখাপড়ার মতই সে ফুটবল খেলতেও ভালবাসে। অবসর মুহূর্তে দাবাতেও চাল দেয়।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম কৃতী ছাত্র অধ্যাপক পরিমল সরকারের পুত্র পুষন সরকার। মোট ৮৩০ নম্বর পেয়ে সে সসম্মানে মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজের ছাত্র গৌতম মণ্ডল এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৮৭৯ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৭৮ সালে সে মাধ্যমিকেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তার দ্বিমুকুট লাভে আমরা আনন্দিত।

উল্লিখিত সকলকেই তাদের কৃতিত্বের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(কোন প্রতিভাই ছোট নয় এই পৃথিবীতে। আজ যারা যশস্বী হয়েছেন, একদিন তাঁরাও ছিলেন তোমাদের মত। তাই তোমাদের মধ্যে যারা কোন না কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছ বা দেখাচ্ছ, আমরা তাদের খবর এই বিভাগে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার করে কোন বিষয়ে, কবে কোথায় কৃতিত্ব দেখিয়েছ লিখে পত্রপাঠ পক্ষিরাজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। দেখ খামের ওপর বিভাগের নাম লিখতে ভুলোনা যেন।)

আর্থার হিন্ডের নামও ডাক-টিকিট সংগ্রাহকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই অর্থশালী লোকটি বেশী বয়সে ডাক-টিকিট সংগ্রহে উদ্যোগী হন। এক সেন্ট দামের একটা ব্রিটিশ গায়েনার টিকিট তিনি সাড়ে বত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে কেনেন। পরে সেই একসেন্টের ব্রিটিশ গায়েনার টিকিট বিক্রি হয় দশলক্ষ ডলারে। হিন্ডের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত টিকিট দশলক্ষ ডলারে কিনে নেন আর এক প্রখ্যাত ডাক-টিকিট সংগ্রাহক—এইচ, আর, হার্মার।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক-টিকিট সংগ্রাহক কে? নিঃসন্দেহে ইটালীর কাউন্ট ফন ফেরারি। মায়ের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ফেরারি দশ বছর বয়স থেকে ডাক-টিকিট সংগ্রহ শুরু করেন। মা তাঁকে আড়াই-কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে যান। সেই সম্পত্তি হাতে পেয়ে ফেরারির ডাক-টিকিট সংগ্রহের নেশা আরও বেড়ে যায়। প্রতি সোমবার ছিল তাঁর ডাক-টিকিট কেনার দিন। সেদিনের জন্য বরাদ্দ থাকত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। ফেরারির মৃত্যুর পর প্রায় ষোল লক্ষ ডলারে তাঁর ডাক-টিকিটগুলো নীলামে বিক্রি হয়।

আজব শখ

অমলেন্দ্রনাথ ঘটক

আমাদের দেশে জাল কুপারের মত ডাক-টিকিট সংগ্রাহক আর কেউ নেই। তিনি সাত বছর বয়স থেকে ডাক-টিকিট সংগ্রহ করতে শুরু করেন। জাল কুপার 'ইন্ডিয়াস স্ট্যাম্প জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক।

খেলাধুলাও এক রকমের শখ। কারণ কে কোন খেলা ভালবাসে সেটা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দের উপর।

আজকের যুগের খেলার সঙ্গে প্রাচীন যুগের খেলার কোন মিল নেই। বাদশাহদের শখ শুধু বিচিত্র ছিল না, বীভৎসও ছিল। মোগল যুগে যে সব বিদেশী পর্যটক বাদশাহের এই সব শখের বিবরণ দিয়ে গেছেন তা শুনলে অবাক হতে হয়। তাঁদের শখের কথা পরের সংখ্যায় বলব।

।। সাত ।।

ভদ্রলোকের হাসিটিও বড় সুন্দর।

ভারি মিষ্টি হাসিটুকু যেন মনে হলো সুনন্দর।

সুনন্দ তাকিয়েছিল তখনো সেই ভদ্রলোকের দিকে।

অতীব সুশ্রী মধ্যবয়েসী ভদ্রলোকটি। টক টকে স্বর্ণ চাঁপার মত গায়ের রঙ। মাথায় কোঁকড়া চুল সযত্নে ব্যাক ব্রাশ করা। চোখে দামী সোনার ফ্রেমের চশমা।

সেই চশমার কাচের ওধার থেকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্র লোকও সুনন্দর মুখের দিকে।

মুখে সেই মৃদু হাসির আভাসটুকু তখনো যেন লেগে আছে।

ভদ্রলোক আবার বললেন, কই আমার কথারত জবাব দিলে না তুমি? ভাল কথা তোমার নামটাত এখনো জানা হলো না। কি নাম তোমার?

সুনন্দ।

সুনন্দ—তা তোমার পদবীটা কি। তোমরা কি জাত।

সান্যাল—ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—তা তোমার বাবা কি করতেন?

হেডমাষ্টার ছিলেন—স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

ভদ্রলোক অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর বললেন আজ রাত অনেক হয়ে গিয়েছে তুমি বাড়ি যাও—এই বাড়িটা তুমি চিনে কাল একবার দুপুরে না—দুপুরে নয় বিকেলে আসতে পারবে?

এখানে? আপনার এখানে?

হ্যাঁ—এখানে—

কেন?

এসো তারপর জানতে পারবে—

পারবো।

আর একটা কথা—

বলুন—

ঐ ছককু—সখারাম—এদের কোন কথা বলো না।

বলবো না।

না। আচ্ছা এবার তুমি এসো।

সুনন্দর হঠাৎ কি হলো—হাত তুলে নমস্কার করলো ভদ্রলোককে—নমস্কার স্যার—আমি তাহলে এখন আসি।

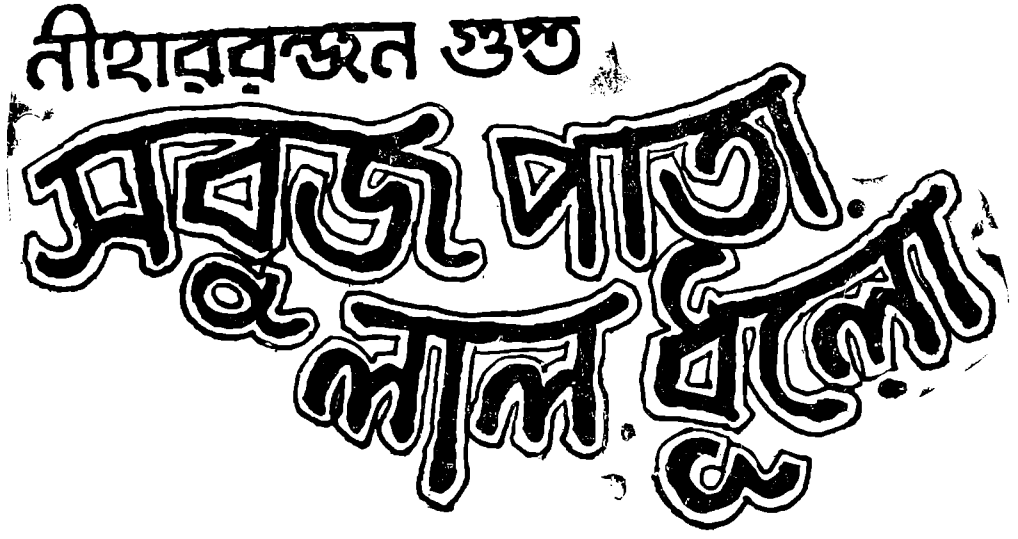

এসো।

যে লোকটি সুনন্দকে ঐ ঘরে ডেকে এনেছিল—ঘরের বাইরে পা দিয়ে সুনন্দ দেখলো সে তখনো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দোর গোড়ায়—

লোকটা একবার সুনন্দর দিকে তাকাল। কিন্তু কোন কথা বললো না।

সুনন্দও কোন কথা বললো না। সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

রাস্তায় গাড়ির মধ্যে বসেছিল ছককু—আর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুকছিল সখারাম।

সখারাম সুনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কত্তা

তোকে কি বলছিল রে ?

কত্তা—কত্তা কে ?

আরে যে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল—সেই ত কত্তা !

ঐ কত্তা—

হ্যাঁ—

তবে সিংজী কে ?

তোর আমার মতই একজন—সিংজীও। তা কত্তা তোকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বলছিল রে ?

কি আবার বলবে—

এই শালা—কত্তা যা তোকে বলেছে বল—নচেৎ দেবো পেট ফাঁসিয়ে।

আমাকে কিছু বলেনি।

তবে অমনি অমনি ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ঘরে—বল—

সত্যি বলছি—কিছু বলেনি।

বলেনি।

না। আমার পরিচয় নিচ্ছিল।

ব্যাস। আর কিছু নয়—

না।

বরাহনগরের সেই বাড়িটার কথা ওঠায়নি তোকে।

না।

ঠিক বলছিস।

হ্যাঁ—

হুঁ, নে চল। গাড়িতে ওঠ।

সুনন্দ গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

কোথায় এবার যেতে হবে—সুনন্দ শুধায়।

খিদিরপুরে—

সেত অনেকটা পথ—সুনন্দ শুধাল।

তাতে কি—চালা।

কিন্তু এই গাড়িটা কোথায় রাখতে হবে—

নে চালা এখন, সময় হলেই জানতে পারবি—

হঠাৎ সুনন্দর কি হলো—সে গাড়ি থামিয়ে দিল—ব্রেক কষে—সুইচটও গাড়ির অফ্ করে দিল।

সখারাম বললে, কি চালা গাড়ি থামালি যে।

আমি আর গাড়ি চালাতে পারবো না।

চালাতে পারবি না মানে ? সখারামের প্রশ্ন রাগত কণ্ঠে।

যা বললাম তার মানে তাই। গাড়ি আমি আর চালাতে পারবো না।

শালা মামার বাড়ির আবদার পেয়েছিস। দে গাড়িতে স্টার্ট দে—ছককু বললে।

ছককু কথাটা তার শেষ করবার আগেই চট্ করে গাড়ির দরজা খুলে সুনন্দ গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। এবং চলে যাবার জন্য পা বাড়ায় সুনন্দ।

সখারাম আর ছককু দু'জনেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

ছককু পথ রোধ করে দাঁড়াল, দাঁড়া—

সুনন্দ তাকালও না ছককুর দিকে—যাবার জন্য পা বাড়ায় আবার।

ছককু সঙ্গে সঙ্গে একটা ল্যাং মেরে সুনন্দকে রাস্তায় ফেলে দেয়—এবং সখারাম পাশেই ছিল চকিতে সুনন্দর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে সুনন্দ রাস্তার উপরে পড়ে গিয়েছিল—একটু বেকায়দায়ই, কিন্তু সখারামের সুবিধা করার আগেই সুনন্দ তার তল পেটে একটা হাঁটুর গোত্তা দিয়ে তাকে ফেলে দিল উল্টে। সখারাম কোঁক করে একটা শব্দ করে পেটে হাত চেপে শুয়েই থাকে।

সুনন্দ ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠেছে—এবং ছককু কিছু বুঝবার আগেই তার চোয়াল লক্ষ্য করে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি চালাল।

সেই ঘুসির আঘাত ছককু সামলাতে পারে না—ছিটকে পড়ে রাস্তার উপরে।

সুনন্দ কিন্তু থামে না।

ছককুর দিকে তাকিয়ে বলল, ওঠ—উঠে দাড়া—

ক্ষমা করো ওস্তাদ—কঁকাতে কঁকাতে ছককু বললে।

ওঠ। আবার চাপা গলায় গর্জন করে উঠে সুনন্দ।

আর এমন ভুল হবে না ওস্তাদ।

ঠিক আছে—আমি চললাম—

না, না—ওস্তাদ—গাড়ি আমরা কেউ চালাতে জানিনা। গাড়িটা এখানে পড়ে থাকলে ওশালা সিংজী আমাদের জান লিয়ে লেবে। ও একের নম্বরের শয়তান। তাছাড়া তুমি চেন না ঐ সিংজীকে—তোমারও জান লিয়ে লেবে—চলো গাড়িটা গ্যারেজে রেখে তুমি চলে যাবে—

কোন গ্যারেজে—বেলতলার গ্যারেজে—

না।

তবে—

সাউথ এণ্ড পার্কে যে সুহাসবাবুর গ্যারেজ আছে—

সুহাসদার গ্যারেজে—নামটা শুনেই সুনন্দ চমকে ওঠে।

সখারাম বললে, তুমি চেনো ওস্তাদ গ্যারেজটা—

চিনি।

চেনো—

হ্যাঁ—

তাহলে সেখানেই চলো গাড়িটা পেঁছে দেবে—

ঠিক আছে—

সুনন্দ গাড়িতে উঠে বসল।

লাগে। এবং সম্বিৎ ফিরতেই কানে এলো—একটা কর্কশ ভারী কণ্ঠস্বর—নেমে এসো—**Get down**!

সুনন্দ নেমে এলো কোন মতে গাড়ির দরজা খুলে।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ সার্জেন্ট।

আরো দেখলো—তার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে একটা পুলিশের জীপের।

পুলিশ সার্জেন্ট বললে, লাইসেন্স দেখাও।

লাইসেন্স—

হ্যাঁ—লাইসেন্স—

সুনন্দ বুক পকেট থেকে লাইসেন্সটা বের করে দিল।

লাইসেন্সটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকতে পুলিশ সার্জেন্ট

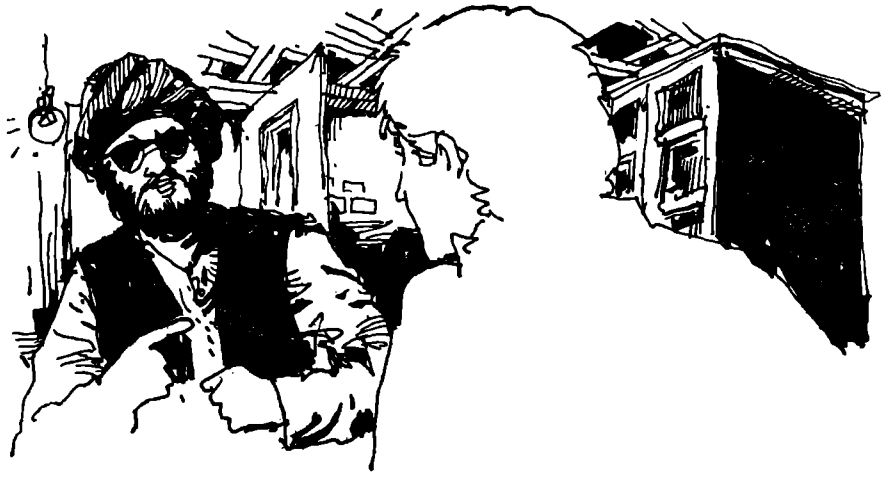

সুনন্দর রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাতের দু'তিন জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল—পায়েও চোট লেগেছিল। জ্বালা করছিল।

কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপ করে না সুনন্দ।

গাড়িতে স্টার্ট দেয়—

কলুটোলা স্ট্রীট থেকে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনুতে পড়তেই একটা জোরালো হেড্ লাইটের আলো এসে ওর চোখে পড়ল ওর চোখের দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যায়।

ও চোখ বোজে—

আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা লাগে তার গাড়িটায় মুখো মুখি কলিশন একেবারে।

ব্যাপারটা বুঝতে ও সামলাতে সুনন্দর কয়েক মিনিট

বললে, এগাড়িটা কার—গাড়িটার মালিক কে?

আ—আমি—

তুমি—তুমি সুনন্দ সান্যাল এই গাড়ির মালিক?

ন—না।

তবে—এ কার গাড়ি—

আমি জানি না।

ঠিক আছে উঠে বোস ঐ জীপে—শিউনন্দন—একে গাড়িতে বসাও—

সুনন্দর যেন এতক্ষণে খেয়াল হয়—চেয়ে দেখলো আশে পাশে—ত্রিসীমানায় কোথাও ছককু ও সখারাম নেই।

(ক্রমশঃ)

বুধুয়া বাবার উপহার

রোথিন সিংহ

তপুর ছোটবেলা থেকেই দুর্গম স্থানে যাবার খুব লোভ। বড় হয়ে সে কি হবে প্রশ্ন করলেই গম্ভীর হয়ে বলত আমি অভিযাত্রী হব।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটির মুখেই উড়িষ্যা থেকে এলেন জ্যাঠামশাই। কথায় কথায় তপুর অভিযাত্রী হবার সংকল্প শুনে বললেন, উড়িষ্যার জঙ্গলে অভিযান যদি করতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো। তপু রাজী হয়ে গেলো। পরের সপ্তাহেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে উড়িষ্যায় চলে এলো তপু। সঙ্গে অবশ্য তপুর দাদাও এলো।

জ্যাঠামশায়ের কাঠের ব্যবসা। জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দেন দূরে দূরে শহরের 'টিম্বার ডিপো' গুলোতে। সেই কাঠ করাত কলে চিরে আসবাব পত্র, জ্বালানী ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়।

গাছ কাটা হচ্ছে। তপু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। ছোটো ছোটো গাছ কুড়ুল দিয়ে কাটছে মজুরেরা। আর বড় বড় গাছ কাটা হচ্ছে করাত দিয়ে।

বেশ কিছুক্ষণ গাছকাটা দেখবার পর তপু যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন দাদা বললো, জেঠু ঐ পাহাড়ের কোলে যে বাড়ী মত দেখাচ্ছে, ওটা কী?

তপু দেখলো বেশ কাছেই পুরোনো আমলের একটা বাড়ীর কিছুটা দেখা যাচ্ছে ঘন গাছগাছালীর মধ্যে দিয়ে। জেঠু বললেন, পোড়ো বাড়ী। এ তল্লাটে কোনো জমিদারের খাম খেয়ালের ফলে তৈরি হয়েছিল ওটা। কেউ যায়না ওদিকে। সাপ খোপের বাসা।

তপুর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিলো ওখানটায় একবার যায়। কিন্তু জ্যাঠামশাইকে কথাটা বলতে পারছিলো না। ওকে অবাক করে দিয়ে ওর দাদাই বললে, জ্যাঠামশাই, আমরা একবার ওদিকে বেড়াতে যাবো?

'নরিয়া' মানে চাকর 'কপিলঅ' কে ডেকে বললেন ওদের সঙ্গে যেতে আর বারণ করলেন ঝোপ ঝাড়ের ভেতর যেতে।

তপু আর ওর দাদা উড়িয়া জানে। তাই কপিলঅ-র সঙ্গে আলাপ জমাতে ওদের দেরি লাগলো না। শাল-পাতায় মোড়া তামাক পাতা, যাকে ওরা বলে 'কাহালি', একটা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলো কপিলঅ।

পোড়ো বাড়ীটার কাছে আসতে আসতে বাড়ীর পুরোনো ইতিহাস ওদের জানা হয়ে গেলো। জানা হয়ে গেলো বিচিত্র একটা গল্প।

বৃদ্ধ জমিদার নরেশচন্দ্র-র বিশ্বস্ত চাকর ছিল বুধুয়া গোন্ড। চাকর এবং দেহরক্ষী দুইই। প্রকান্ড একটা 'টাঙি' কাঁধ ফেলে সর্বদা ঘুরতো নরেশচন্দ্রের পেছন পেছন। শোনা যায় 'টাঙি'র এক কোপে একটা জলজ্যান্ত বাঘের মাথা নাকি পুরোপুরি নামিয়ে দিয়েছিলো বুধুয়া।

নরেশচন্দ্রের ছেলে তরুণ সুরেশচন্দ্র উচ্ছৃংখল ও অত্যাচারী। প্রজাদের দিকে লক্ষ্য না করে নিজের আরামের জন্যই ব্যস্ত। বুড়ো নরেশচন্দ্র অসহায় তখন। পক্ষাঘাতে শরীরের একটা দিক অকেজো হয়ে গেছে। একমাত্র ভরসা বুধুয়া। দেওয়ান নায়েব সব সুরেশচন্দ্রের অসংযত আচরণের সুযোগে যে যার আখের গুছোতে ব্যস্ত।

সেবার সুরেশচন্দ্র প্রজাদের একেবারে নিঃশেষ করে লুটে নিয়ে এলো অনেক সোনাদানা। তারপর চললো

দিবারাত্র অবিরাম ফুর্তি, হৈ-হুল্লোড়।

বেচারা নরেশচন্দ্র শুধু তাকিয়ে দেখলেন। পুত্রবধু একমাত্র ছেলেকে বুকে জড়িয়ে শ্বশুরের পায়ে কেঁদে পড়লো, রাজ্যের সবার অভিশাপ থেকে আপনি আপনার নাতিকে বাঁচান বাবা। ওর বাপের পাপের ফল যেন ওকে না ভুগতে হয়।

নরেশচন্দ্র বুধুয়াকে ডেকে বললেন, লুটের ঐ টাকাতে সারারাজ্যের অভিশাপ লেগে আছে। ও ধনে যে হাত দেবে সে জ্বলে পুড়ে যাবে। বংশে কেউ আর থাকবে না। বুধুয়া তুইই আমার বংশকে বাঁচাতে পারিস। আমার নাতিটিকে তুই ঐ অভিশাপের বোঝা থেকে বাঁচা।

বুধুয়া অবাক হয়ে তাকালো মনিবের দিকে। বললে, আমি কী করতে পারি বলুন হুজুর, আমার জান কবুল।

নরেশচন্দ্র পুত্রবধূকে বললেন, তুমি এঘর থেকে যাও মা। আমার দাদুভাইয়ের গায়ে কোনো পাপের হাওয়া লাগতে আমি দেবোনা। তারপর একান্তে বুধুয়াকে বললেন লুটের ধন-দৌলত সুরেশের কবল থেকে সরিয়ে ফেলতে আর দেখবে যেন ওর প্রতিটি পাই গরীবদের প্রয়োজনেই লাগে। নাহলে তাদের অভিশাপের দাগ মুছবে না।

গভীর রাতে সুরেশচন্দ্রের নিভৃত আড্ডায় হানা দিয়ে বুধুয়া প্রমাণ সাইজের একটা সিন্ধুকে করে সমস্ত ধনরত্ন সরিয়ে ফেললো। যখন সুরেশচন্দ্রের দলের সবাই আনন্দে মত্ত ছিলো সেই সুযোগে বুধুয়া সিন্ধুকটা কাঁধে করে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। কেউ বলে, জনা দশেকের সঙ্গে লড়াই করে স্বয়ং সুরেশচন্দ্রের মাথায় ডান্ডা মেরে বুধুয়া সিন্ধুক নিয়ে পালায়।

সে যাই হোক, সিন্ধুক নিয়ে বুধুয়া সেই যে অদৃশ্য হোলো কেউ জানেনা সে কোথায় গেলো। বৌরাণী মারা যাবার আগে বুড়ি রাধির মাকে বলেছিলেন যে বুধুয়া এই জঙ্গলের বাড়ীটার নীচেই একটা গোপন কুঠুরিতে সিন্ধুকটা নিয়ে বহুদিন লুকিয়ছিলো। কিন্তু একথা জানবার আগে বা পরে কেউ কোনোদিন বুধুয়াকে দেখেনি। সে আজ প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। কিন্তু এরপর প্রজাদের অনেকেই তাদের অতি সংকটের সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়েছে। গরীব মধু মহাপাত্র মেয়ের বিয়ে দিতে পারছিলোনা টাকার অভাবে। তার ঘরে এই নিয়ে অশান্তির শেষ ছিলোনা। একদিন ঝগড়া-ঝাটি যখন চরমে উঠলো তখন তিতি-বিরক্ত হয়ে মধু জঙ্গলের পথে পা বাড়ালো। উদ্দেশ্য – আত্মহত্যা করা।

জঙ্গলের পোড়োবাড়ীটার কাছাকাছি এসে দেখলো পথের ধারে গাছের নীচে একটা ছোটো থলি। যেন কেউ সদ্য রেখে গেছে। আশে পাশে বাঘ ভালুকের উৎপাত। অজানা কোনো লোক হয়তো বিপদে পড়তে পারে ভেবে হাক দিলো মধু—কেগো গাছের তলায় থলি রেখে গেছো? —কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পরও কোনো সাড়া পেলোনা যখন, তখন গিয়ে থলির মুখটা ফাঁক করেই ও একেবারে অবাক। গোটা পঞ্চাশেক সোনার মোহর তাতে! গ্রামে ফিরে সবিস্তারে সকলকে জানালো সব কথা। কেউ দাবী জানালো না মোহরের ওপর। সকলেই একবাক্যে রায় দিলে যে এ হচ্ছে বুধুয়ার ঋণ শোধের ব্যাপার।

তারপর, অনেক অনেক লোক এমনি ভাবে নিদারুণ সংকটের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য পেয়েছে। তাই লোকে ঐ বাড়ীর নাম দিয়েছে বুধুয়া বাবার আস্তানা। বছরে একবার করে মেলা বসে ওখানে। লোকে একটা পাথরের গায়ে সিঁদুর চন্দন লেপে বুধুয়া বাবার পুজো দেয়।

গল্পেতে এতো মজে গেছিলো ওরা যে খেয়ালই করেনি কখন পোড়ো বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অজস্র ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝুপসি অন্ধকার জড়িয়ে আছে বাড়ীটার সর্বত্র। আগাছায় ভরে গেছে উঠোন দেয়াল সব। ফাটল ধরা বাড়ীর গায়ে অগুন্তি বট, অশ্বত্থের গাছ গজিয়ে উঠে একটা অদ্ভুত ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

দাদা তপুকে বললে, তোর ভয় করে তো বাইরে দাঁড়া। আমি ভেতরটায় গিয়ে গোটা কতক ফটো তুলে নিয়ে আসি। বললে, ভয়? চলো আমিও যাবো। কপিলও অসহায় ভাবে শুধু একবার বললে, 'সাঁপও থিবাগো বাবুমানে' অর্থাৎ সাপ থাকতে পারেগো বাবুরা। কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মাকড়সার জাল সরিয়ে, অজস্র চামচিকের ঘুম ভাঙিয়ে ওরা ভেতরের উঠোন পেরিয়ে ঢাকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

বড় বড় ঘর। চারিদিক ঘেরা বাড়ীটার একদিকে বিরাট একটা হলঘর। আর তার দু'পাশে দুসারি ঘর। উঠোনের একপ্রান্তে একটা পাথর। তারগায়ে সিঁদুর-চন্দনের ছাপ বেশ বোঝা যায়। তপু বললো, আমাকে একটু ফটো তুলতে দিবি দাদা? দ্বিধা করলো না দাদা। ওরা হলঘরটার মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। তপুর হাতে ক্যামেরা। হলঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ভ্যাপসা একটা গন্ধ।

হলঘরের ভেতর দিয়ে তপু দাদার সাথে ডানদিকের সারিবাঁধা ঘরগুলোয় ঢুকলো। পেছন ফিরে দেখলো কপিলও নেই। চারিদিকে বহু আসবাব। এখনো ব্যবহারযোগ্য। প্রথম ঘরটায় একটা ছোটো খাটিয়া তপুর

মনটাকে এতোই আকর্ষণ করলো যে ও সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। হাতির দাঁতের সুন্দর সুন্দর হাতি, ঘোড়া, নানা জন্তু জানোয়ার, পশুপাখী যেন লেপটে আছে খাটিয়ার সর্বাঙ্গে। হঠাৎ পাশ থেকে কপিলঅ বললে, এটা সুরেশচন্দ্রের ছেলে বীরেশচন্দ্রের ছেলেবেলাকার খাটিয়া। বৌরাণী ছেলেকে নিয়ে এ রাজ্য থেকে পালিয়ে যান তাঁর বাপের বাড়ী রাজস্থানে। তখন থেকে এগুলো এমনি পড়েই আছে।

তপু ফ্ল্যাশ দিয়ে খাটিয়ার একটা ছবি তুললো। কপিলঅ বললে, চলো বাবু তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

কপিলঅর সঙ্গে তপু পাশের ঘরের কোণের একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলো। বেশ খানিকটা নামার পর কপিলঅ আধো অন্ধকারে দেশলাই জেবলে বললে, এই দ্যাখো। তপু দেখলে, ছোট্টো একটা ঘরে একটা খাটিয়া পাতা। খাটিয়ার নীচে মেঝেতে দুটো লোহার আংটা বসানো। দুহাতে লোহার আংটা দুটো ধরে টান মারতেই চৌকোমত একটা অংশ ওপরে উঠে এলো! ভেতরে মাঝারি সাইজের একটা কাঠের বাক্স। তপু ইতিমধ্যে দুটো ছবি তুলে ফেলেছে। কপিলঅ নির্দ্বিধায় বাক্সের ডালা খুলে দেখালে। বাক্সটা সোনা-রুপোর গয়নায় ভরা। আবার ফটো তুললে তপু। কপিলঅ একটা সোনার মোহর তপুর হাতে দিয়ে বললে, এটা নাও তোমার 'মুদ্রা-সংগ্রহে' জমা করেদিও। কিন্তু খবরদার ধনরত্নের হদিশ কাউকে বলবে না।

তপুর মাথা ভীষণ সাফ। অন্তত মাষ্টারমশাইরা তাই বলে থাকেন। ও ঝপ্ করে বলে বসলো, কিন্তু তুমি এ ধনরত্নের খবর জানলে কী করে কপিলঅ? আর আমি যে নানা দেশের মুদ্রা-সংগ্রহ করি সে কথাই বা কে বললো তোমাকে?

কপিলঅ জবাবে মুচ্‌কি হেসে বললে, খুব চোখা আছোতো বাবু! কিন্তু কোনো জবাব দিলোনা তপুর প্রশ্নের।

এরপর ওরা ওপরে উঠে এলো।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তপুর কানে গেলো দাদার চীৎকার—তপু—পু—উ··· ··· !!

উৎকণ্ঠিত ভাবে ছুটে গেলো তপু, কী হয়েছে দাদা?

দাদা ওকে দেখে রেগে বললে, কোথায় ছিলি তুই? তপু বললে, কপিলঅর সঙ্গে ঐ ঘরের নীচে বুধুয়া বাবার ঘর দেখতে গিয়েছিলাম। দাদার পেছন থেকে কপিলঅ বললে, আ—আমার সঙ্গে? আমি তো বাবুর সঙ্গে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই তখন থেকে!

ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালো তপু। তাড়াতাড়ি হল-ঘরটার পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো। নীচে নামার কোনো সিঁড়ি তো ওখানে নেই! দাদা রাগত ভাবে বললে, আজে বাজে কথা বলে দিলেই হোলো?

তপু বললে, আমি ফটো তুলেছি বুধুয়ার খাটের আর আ—থমকে গেলো ও। পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, মোহরটা হাতে ঠেকছে। না, ও স্বপ্ন দেখেনি। সত্যিই মোহরের আর গয়নাগাঁটির বাক্স দেখেছে ও।

দাদা ওর হাত থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে দেখে, চারটে শট্ নেওয়া হয়ে গেছে।

এরপর দাদা কেনজানি আর কোনো প্রশ্ন করলোনা।

ব্যাপারটা ওরা জ্যাঠামশায়ের কাছে বেবাক চেপে গেলো!

কলকাতায় ফিরে নেগেটিভের রোলটা ফটোর দোকানে ডেভেলাপিং-এর জন্যে দিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে ওরা।

কিন্তু নিরাশ হতে হয়। বীরেশচন্দ্রের খাটের ফটো আছে কিন্তু তারপরকার তিনটে শট্‌ই একেবারে "ওয়াশ্-আউট"। তপু যত বলে যে দিনের মত পরিস্কার আলোয় সব দেখেছে ও ফটো তুলেছে ততই মিথ্যে আর বানানো গল্প বলে উড়িয়ে দেয় দাদা। বলে কপিলঅ তোর সঙ্গে যায়ইনি। ওতো আমার সঙ্গেই ছুটোছুটি করে খুজছিলো তোকে।

এতোটা অবিশ্বাস সহ্য করা অসহ্য হল তপুর পক্ষে। নিজের সুটকেশে রাখা মোহরটাকে বের করে দেখিয়ে বললে, এটাও কি মিথ্যে?

দাদার চোখ ছানাবড়া। বললে, এটা তুই পেলি কোথা থেকে?

তপু বললে, কপিলঅ তার নিজের হাতে বুধুয়ার বাক্সের ডালা খুলে আমাকে দিয়েছে।

এরপর দাদার মুখে আর কথা জোগায়নি।

এর কিছুদিন পরেই বড় রকমের অসুখের জন্যে তপুর জ্যাঠামশাই কলকাতায় চলে এলেন। আর উড়িষ্যায় থাকতে তিনি নারাজ। কলকাতাতেই মোটামুটি ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

এর বহুদিন পরে জ্যাঠামশাইকে পুরো গল্পটা বলেছিলো তপু।

বুধুয়ার দেওয়া সেই সোনার মোহরটা তপুর কাছে আজও আছে।

শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

তোমাদের প্রিয় পক্ষিরাজ ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

ফোন : ৩৪-৩১৪৬

সংবাদ-বিচিত্রা

বিশ্বামিত্র

* প্রথম ফুটবলের কিংবদন্তী ব্রাজিলের পেলে 'শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড়' সম্মান পেলেন। ফরাসী ক্রীড়া সংবাদপত্র লা ইকুইপ যে নির্বাচনের আয়োজন করেছিল তাতে অংশ নিয়েছিল বিশ্বের কুড়িটি সংবাদপত্র। পেলে পেয়েছেন ১৭৮ পয়েন্ট।
* এবছর মস্কো ওলিম্পিকে উপস্থিত প্রতিযোগীদের মধ্যে সব থেকে কম বয়সী প্রতিযোগী ছিলেন ১৩ বছর বয়স্কা সাঁতারু গারনেট চারওয়াট (মিকারাগুয়া আর সব থেকে কম ওজনের ছিলেন জিমনাসটিকে মিস মেন থি তোই (কোরিয়া)। তার দেহের ওজন ছিল মাত্র ২৫ কিলোগ্রাম।
* যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল এক গরীব মেষপালকের বাড়ীর জাব-পাত্রে আর পরম পুরুষ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়েছিল কামারপুকুরে ক্ষুদিরামের বাড়ীর ঢেঁকিশালে।
* ১৯১০ সালে যুগোশ্লোভিয়ার স্কপজে শহরে মাদার টেরেসার জন্ম। ১৯২৮ সালে শিক্ষকতার কাজে কলকাতায় আসেন। ১৯৪৬ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর ট্রেন যোগে দার্জিলিং যেতে যেতে হঠাৎ দরিদ্র মানুষের সেবার কথা তাঁর মনে উদয় হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি বিদেশী পোশাক ত্যাগ করে শাড়ী পরেন। ১৯৫০ সালে তিনি মিশনারীজ অব চ্যারিটিজ নামে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

  ১৯৭৯ সালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।
* খোলা চোখে আকাশের দিকে তাকলে সূর্য চন্দ্র তারা আর বড়জোর একমুঠো নীল আকাশ চোখে পড়ে। তার বেশী আর কিই বা আছে? এ প্রশ্ন যে কোনও কৌতূহলী মনের।

  সেই কৌতূহল মেটাতে এগিয়ে এসেছে মসকোর প্রগতি প্রকাশন, ঝরঝরে বাংলা ভাষায় ছাপা ইয়া পেরেলমান রচিত ও শুভময় ঘোষ অনূদিত 'জ্যোতির্বিদ্যার খোশ-খবর' নিয়ে।

  'শ্বেত রাত্রি আর অন্ধকার দিন' থেকে শুরু করে জ্যোতির্বিদরা কেন গ্রহণ দেখলেন এমন অনেক কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এখানে। ছাপা সুন্দর, বাঁধাই চমৎকার। দাম চারটাকা পঁচাত্তর।

আনন্দ সংবাদ !

মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতা !!

গৌর দাস, বাঁশবাড়ী হাইস্কুল, মালদা, পক্ষিরাজ আহূত মাসিক ছড়া প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। তার এই প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হওয়ায় কার্তিক মাসের ছড়া প্রতিযোগিতার নামকরণ হল—গৌর সাহিত্য প্রতিযোগিতা।

প্রথম পুরস্কার ঃ ১০ টাঃ দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৫ টাঃ

ছড়ার কোনও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। যে কোনও বিষয়ের ওপরেই লেখা যেতে পারে। তবে মৌলিক ও ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

একজন প্রতিযোগী একটি ছড়াই পাঠাতে পারবে। লেখা পাঠাবার সময় খামের ওপর 'গৌর সাহিত্য প্রতিযোগিতা' কথাটি উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত ছড়া দুটি রচয়িতার নাম সহ পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে এবং পুরস্কারের টাকা M. O. যোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ছড়া পাঠাবার শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর '৮০।

বিঃ দ্রঃ পক্ষিরাজের পাঠক/পাঠিকাদের মধ্যে যে কেউ এই নব পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারেন। অর্থাৎ কেউ ১৫·০০ টাকা (প্রথম পুরস্কার ১০ টাকা ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৫ টাকা) সহ এক কপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো (অবশ্যই প্লসিতে ছাপা) পত্রিকা অফিসে পাঠালে, অনুরূপভাবেই আমরা পরবর্তী কোনও মাসে সেই ছবি প্রকাশ করব এবং সেই নামে সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করব।

এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবার পর যারা আগে ছবিসহ টাকা পাঠাবেন, তারাই এতে অগ্রাধিকার পাবেন।

রুমালের আবির্ভাব

বাজনা থামতেই যাদুকর ঢুকলেন।
হাতে ছিপি আঁটা একটি বোতল।
তিনি ছিপি খুলে দেখালেন—
না, বোতলের মধ্যে কিছু নেই।
কিন্তু বোতলের গায়ে যাদুদণ্ড
বোলাতেই সঙ্গে সঙ্গে বোতলের
ভেতর আবির্ভাব ঘটল একটা
রঙীন রুমালের!

কেমন করে হচ্ছে শোন:
বিশেষ ধরণের
ফাঁপা এই ছিপিটার
মধ্যে রুমালটা লুকানো থাকে
এবং ওর প্রান্তভাগের
সঙ্গে একটা সুতো বাঁধা থাকে।
বিশেষ ধরণের এই ছিপির
মধ্যে লুকানো রুমালটাতে
বাঁধা সুতোটার অপর প্রান্ত

বোতলের গায়ের কোনও
একটা ছিদ্র দিয়ে বাইরে
রাখতে হবে।
যাদুকর যখন বোতলের
শূন্যতা সম্পর্কে দর্শকদের
নিঃসন্দেহ করার চেষ্টা করবে
সেই ফাঁকে তার সহকারী বোতলের ছিদ্রপথে
বেরিয়ে আসা সুতোটা ধরে টানলেই রুমালটার
আবির্ভাব ঘটবে বোতলের ভেতর।
হাততালি অবশ্যম্ভাবি!

ডাকু
ও
প্রোঃ ইকনমিস্ট
শৈল চক্রবর্তী
শোনো, অপচয় বন্ধ না করলে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না, বুঝলে কিছু?
না, স্যার!
এই ধরো এইটুকু কয়লা, এই থেকে হচ্ছে শক্তি, শক্তি থেকে হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ থেকে-?
আলো
রাইট!
আচ্ছা, তাহলে, আলো কম জ্বালালে বিদ্যুৎ বাঁচছে কেমন?
বিদ্যুৎ বাঁচলে কয়লা বেঁচে যাচ্ছে – তাই না?
হ্যাঁ স্যার!
ভেরী গুড! এক-এক ইউনিট থেকে লাখ লাখ ইউনিট, তা থেকে লাখ লাখ টন কয়লা বাঁচছে, ঠিক ত?

সেই কয়লা আমরা বিদেশে রপ্তানি করে অনেক টাকা লাভ করতে পারি! তাহলে শুধু আলোর অপচয় বন্ধ করলে, কি হবে?
বলতে পারলে না? দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে!
পিছনের দেয়ালে
দেশের সম্পদ একটু বাড়ানো যাক! সুইচটা অফ করে দিই!
ক্লিক্
দুদ্দাম্
আলো নিভেই এই বিপত্তি! ওরে, আমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা-
ডাক্তার মানেই ত অপচয়, স্যার!

ছেলেবেলার গল্প

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবার ইচ্ছে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হোক। মা চাইছেন তাকে ডাক্তার করতে। ছেলের অংকর মাথা দারুণ। কিন্তু রক্ত দেখলে সে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। ইনজেকশনের নামে তো কথাই নেই। কোথায় যে পালিয়ে যাবে—তখন তাকে খুঁজে বের করা শিবেরও অসাধ্য।

যে ছেলে রক্ত দেখলে ভয় পায়, ইনজেকশনের নামে পালিয়ে যায় সে আর যাই হোক ডাক্তার সে কোনদিন হতে পারবে না— এ কথাটা তার মাকে বোঝায় কে? তিনি তাঁর ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেনই।

ভাগ্যিস তার বাবার অন্য ইচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ার—তা সে হতে পারে। অংক কষতে ভালই লাগে। অ্যালজেবরা, জ্যামিতি দিব্যি চটপট করে ফেলে। প্রত্যেক বিষয়ে সে ভাল নম্বর পায়। তবে অংকের কথা আলাদা। একশর মধ্যে একশ সে পাবেই। তাই বাবাও খুব খুশি। ছেলে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবেই হবে।

ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করার স্বপ্নে বাবার খুব কড়া নজর। অন্য ছেলেরা যখন ব্যাটবল হাতে মাঠে হৈ চৈ করে অজিত তখন বাড়িতে বসে হয় পড়ে না হয় তো অংক কষে। ক্রিকেট ধ্যাত্ ও আবার ভাল ছেলেরা খেলে না কি? যারা লেখাপড়া করে না, খারাপ ছেলে তারাই তো দিনরাত ব্যাট-বল হাতে নিয়ে মাঠে পড়ে থাকে। অজিতের বাবার কড়া হুকুম, খবরদার ওদের সঙ্গে মিশবে না। মাঠে গিয়ে খেলবে না।

ছোট্ট একটা ছেলের পক্ষে সব সময় তাই কি মানা সম্ভব? বাবার চোখ এড়িয়ে প্রায়ই সে পাড়ার মাঠে হাজির হয়। বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে। খুব যে একটা ভাল লাগে তাও না। খেলার নামে খানিকটা হৈ চৈ তো হয়। অবশ্য বেশীক্ষণ খেলতে পায় না সে। একটু পরেই বাড়িতে খোঁজ পড়ে। মা ডেকে পাঠান। তারপর সেই একই কথা, ভাল ছেলেরা কখনো খেলে সময় নষ্ট করে না। ক্রিকেট—ও তো ভাল ছেলেদের খেলাই নয়। এই পরিবেশের মধ্যে বড় হতে থাকে অজিত।

সেবার পরীক্ষায় ও প্রথম হলো। অংকয় পুরো নম্বর পেলো। বাবা খুব খুশি। খুশির চোটে ছেলেকে একটা ক্রিকেট ব্যাটই কিনে এনে দিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দারুণ নাম করা ব্যাটসম্যান নিল হার্ভের অটোগ্রাফ দেওয়া ব্যাট। নিল হার্ভের নাম, তাঁর ছবি তখন প্রায়ই কাগজে ছাপা হয়। দুরন্ত ব্যাটসম্যান, দুচোখ ভরে দেখার মতো তাঁর ব্যাটিং। অজিতও কাগজে পড়েছে তাঁর কথা। দেখেছে নিল হার্ভের ছবি। সেই নিল হার্ভের অটোগ্রাফ দেওয়া ব্যাট কিনে এনে দিয়েছেন তার বাবা। অজিত দারুণ খুশি। অবাকও হয়েছে খুব। বাবা তাকে ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেবেন—এ কথা সে জীবনে কোনদিন ভাবতেও পারে নি।

অজিতরা বরাবর টেনিস বলে খেলতো। ডিউস বলে খেলার মতো ব্যাট তাদের কারোর কাছে ছিলো না।

এতোদিনে অজিত পেলো একটা। এবার ডিউস বল একটু-আধটু খেলা যেতে পারে।

অজিত জানতো, ব্যাট কিনে দিলেও বাবা তাকে মোটেই খেলার মাঠে সময় কাটাতে দেবেন না। এই ভাবেই কেটে গেলো স্কুলের বছরগুলো। খেলার মাঠে অজিত পাত্তা পেলো না বটে, স্কুলে কিন্তু ভাল ছেলে বলে নাম করলো। ভাল ছেলেদের মতো রেজাল্টও করলো। বাবা খুব খুশি। মাও। মা অবশ্য ততোদিন বুঝে গেছেন — অজিতকে আর যাই হোক ডাক্তার করা যাবে না। একটা টিকে কিংবা টি. এ বি. সি ইনজেকশান নিয়ে যে ছেলে পাড়া মাতিয়ে দেয় সে যে কোনদিন ডাক্তার হতে পারবে না

তা তো জানাই। বাবা খুব খুশি। তাঁর ইচ্ছেই পূর্ণ হতে চলেছে। অজিতকে তিনি ইঞ্জিনিয়ার করবেনই। হবে নাই বা কেন? অংকয় কতো নম্বর পেয়েছে সে। কলেজে সায়েন্স পড়বে। ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স আর কেমিস্ট্রি নেবে। তারপর ঢুকিয়ে দেবেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে।

বোম্বাইয়ের নাম করা কলেজ এলফিনস্টোনে ভর্তি হলো অজিত। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারিতেই তার সময় কেটে যেতো বেশী। খেলার সময় ধরতে গেলে পেতোই না। অজিতদের বাড়ি শিবাজী পার্কের পাশে। পার্কে বল নিয়ে তাকে ছোড়াছুড়ি করতে দেখেছেন অনেকেই। কেউ কেউ তাই দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন। অবাক হয়ে ভেবেছেন, ছেলেটার হাতে তো দারুণ টিপ।

এলফিনস্টোন কলেজের ক্রিকেট ক্যাপ্টেন যতীন রেলে অজিতের হাতের টিপের কথা জানতেন। অনেকবার তাকে দূরত্ব কোণ থেকে বল ছুড়ে উইকেট ভেঙ্গে দিতে দেখেছেন। আর বন্ধুরা জানতো ওর ঢিল ছুলে আম পাড়ার কথা। এক ঢিলে দু-চারটে আম অজিত যে কোন সময়ই পাড়তে পারে।

রেলে অজিতকে এলফিনস্টোন কলেজের বাদশ ব্যাক্তি করতে চাইলেন। তখন কলেজের কোচ ছিলেন মাধব মন্ত্রী। টেস্ট খেলেছেন। বোম্বাইয়ের ক্যাপ্টেন ছিলেন তার ওপর টেস্ট দলের নির্বাচক। দারুণ কড়া লোক কেউ যদি ডিসিপ্লিন ভাঙ্গে তাহলে আর রক্ষে নেই। অজিতের সঙ্গে মাধব মন্ত্রীর গোলমাল লাগলো প্রথম দিন থেকেই। ল্যাবরেটারিতে প্রাকটিক্যাল ক্লাসের কাজ শেষ করতে রোজই ওর দেরি হয়ে যেতো। কাজ-টাজ শেষ করে ও যখন মাঠে যেতো নেট প্রাকটিশ ততোক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওকে দেরিতে আসতে দেখে মাধব মন্ত্রী রেগে যেতেন। ওর কোন কথাই শুনতেন না। শাস্তি দিতেন। মাঠের চারপাশ দৌড়তে হত অজিতকে। শুধু তাই নয় মন্ত্রীর অনিচ্ছায় রেলে কিছুতেই অজিতকে টুয়েলভথ ম্যান ও করতে পারতেন না।

সেদিন কলেজের যে রেগুলার টুয়েলভথ ম্যান সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো রেলে সেই সুযোগ নিয়ে অজিতকে মাঠে নামার জন্য ডেকে পাঠালেন। অজিত তখন ল্যাবরেটারিতে বসে ফিজিক্সের প্রাকটিকাল করছে। খবর পেয়ে চটপট তৈরি হয়ে সে যখন মাঠে এসে হাজির হলো তখন লাঞ্চ প্রায় হয় হয়।

কলেজের একজন খেলোয়াড় অজিতকে অতো দেরি করে আসতে দেখে বলে উঠলেন,

"আরে তুমি তো ঠিক ঠিক সময়ে এসে গেছো। লাঞ্চটাও মিস করবে না। আবার পকেটমানিও পাবে।"

কথাটা অজিতের মনে বড্ড লাগলো। সে ভাল খেলতে পারে না বলে তাকে এতোবড় অপমান। এর জবাব দিতেই হবে। এই অপমানের একমাত্র জবাব ভাল খেলা। ভাল তাকে খেলতেই হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, ইচ্ছে করলে সেও তাদের কলেজের যে কোন খেলোয়াড়ের মতোই খেলতে পারে।

অনুশীলন শুরু করল অজিত। মন দিয়ে খেলতে লাগলো সে। তাই বলে লেখাপড়ার দিকটাও বাদ দিলো না। একসঙ্গে চলতে লাগলো খেলা আর লেখাপড়া।

কিছুদিন পরে কলেজ বদলালো অজিত। এলফিনস্টোন ছেড়ে রুইয়া কলেজে চলে এলো সে। এসেই চান্স পেয়ে গেলো রুইয়া কলেজ ক্রিকেট দলে। কিন্তু ব্যাটসম্যান নয়, বোলার হিসেবেই সে আত্মপ্রকাশ করলো। ন্যাটা স্পিনার। প্রথম খেলাতেই অজিত ছ'টি উইকেট দখল করলো।

পরের বছর অজিত ব্যাটিংয়ের দিকে বেশী নজর দিলো। বোলিংয়ের চেয়ে ব্যাটিংই তার অনেক বেশী ভাল লাগছে। কলেজ ক্রিকেটে অনেক রান করতে লাগলো। সেঞ্চুরি হাঁকাতে লাগলো। ফলে সে চান্স পেয়ে গেল বোম্বাই বিদ্যালয় দলে।

আর তারপরই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো অজিত ওয়াদেকারের নাম। কলকাতার কাগজগুলিতে ছাপা হলো বড় বড় করে তার কথা। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অজিত ওয়াদেকার নামে একটি ছেলে দিল্লীর বিরুদ্ধে ৩২৪ রান করেছে। ভেঙ্গে দিয়েছে চন্দ্রভানের ২৭৬ রানের রেকর্ড। ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবার ঠিক আগে সুনীল গাভাসকার ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন অজিত ওয়াদেকারের ৩২৪ রানের রেকর্ডটিকে।

দিল্লির বিরুদ্ধে অজিত ওয়াদেকারের ঐ ৩২৪ রানের ইনিংসটি তাকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার ডাক পড়লো বোম্বাই দলে। বোম্বাই দলে তখন টেস্ট খেলোয়াড়দের ভিড়। পলি উমরিগর অধিনায়ক। তাঁদের মধ্যে এক নবাগত অজিতের অন্তর্ভুক্ত তো হবেই। তবু সে ভালই খেললো। রণজি ট্রফিতে তার প্রথম দুটি খেলা ছিল সার্ভিসেস আর বাংলার বিরুদ্ধে। দুটি খেলাতেই সে ৮০ র কাছাকাছি রান করলো। সেই সঙ্গে প্রায় পাকা হয়ে গেলো বোম্বাই দলে অজিত ওয়াদেকারের স্থান।

তারপর?

তারপরের কাহিনী তো সকলের জানাই।

ধাঁধা

কার্তিক : এক্সেলি

১। প্রতি বছর রুপার জন্মদিনে ওদের বাগানের গাছগুলোকে বেলুন দিয়ে সাজানো হয়। এবার কিন্তু রুপার বাবা অন্য একটা মজার খেলার ব্যবস্থা করেছেন বেলুন দিয়ে। বাগানে একটা বড় টেবিল পেতে তার উপর তিনসারিতে ন'টা বড় বড় বেলুন আটকে দিয়েছেন পিনের সঙ্গে (ছবি দেখ)।

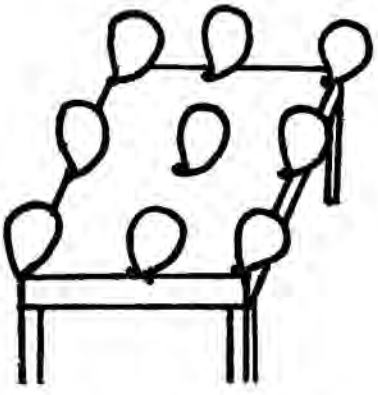

বন্ধুদের হাতে একটা ছোট বন্দুক দিয়ে বলেছেন, গুলি করে বেলুনগুলো ফাটাতে। এর চেয়ে সহজ এবং মজার খেলা আর কি হতে পারে? কিন্তু দুটো সর্ত আছে, তারা-ই একটু গোল বাধাচ্ছে। এক সারিতে যে-কটা বেলুন পড়বে, ঠিক মত মারতে পারলে তা একটা গুলিতেই ফাটানো যায়। প্রথম সর্তটা এই যে, মোট দুটো জায়গায় দাঁড়ানো চলবে। দ্বিতীয় সর্ত, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুটোর বেশী গুলি ছোঁড়া যাবে না। এ দুটো সর্ত মেনে সবগুলো বেলুন কি করে ফাটানো যায়?

২। যদি SAIL=22, SAILOR=33 এবং CAP=12 হয়, তবে CAPTAIN = কত?

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর

হ্যাঁ, ভুলুবাবু সত্যিই ভুল করেছেন। ওই চিঠিটাও সেই তালা লাগানো লেটার বাক্সেই ফেলবে পিওন। রাখাল চাবির সন্ধান পাবে না।

নির্ভুল উত্তরদাতা :

অমিতাভ মজুমদার (গ্রা, ১২১৪)—নিউ দিল্লী ২৯। অশোক, অশেষ, বাবলি, বিভা ও গুরুদাস ঘোষ সরকার পোল, ২৪ পরগণা। অনমা, যোগমায়া ও বাবু মিত্র—মিত্রপাড়া, চণ্ডীতলা অঞ্জনা, অলক, বুবাই ও বুকাই দেব—কলকাতা ২। ঊর্মিলা রায়—নয়নকানন, বারাসত। কাঞ্চন দে, তপন আঢ্য—কালনা, বর্ধমান। কাকলী, সোনালী ও মিতালী রায়, রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ—আরামবাগ। তরুণ ও তুষারবাহিত বারিক—কলকাতা ২৩। তাপস বণিক—চিত্তরঞ্জন টাউনশিপ ৪১। তাপস সাহা—অরবিন্দ এ্যাভিনু, দুর্গাপুর। দেবাশিস ব্রহ্মচারী, রত্না, পার্থসারথী, পিয়াসী দে সরকার—বহরমপুর। দেবাংশু ভৌমিক—রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর। দীপালী, দীপক, সুনীল, অনুরাধা গুপ্ত, মা ও বাবা—হেতমপুর, বীরভূম। দীপক, মা, বাবা, অপর্ণা, মামীমা, চায়না, মাধুরী, রবীন, সরোজ, প্রদীপ, অম্বিকা, শান্তিদা, রঞ্জিতদা, দীপু, রঘুনাথ চেল, রত্না, রামু, বাপী, অজয়, দীপক ও দীপু চৌবে রথীন চক্রবর্তী, উজ্জ্বল প্রামানিক - আনাড়া, পুরুলিয়া। পঞ্চানন গুছাইত (গ্রা, ৬৯৪), প্রশান্ত বসু ও রুপা করাতি—হাওড়া ১। পাপু, শোভন, কুমকুম, রুমা - বাঁধা পুকুর পাড়, কান্দী। প্রবীর, রমেশ, নারু, গৌতম—বেথুয়াডহরী। প্রসুন চট্টোপাধ্যায় ও শেখ মিজানুর রহমান—দুর্গাপুর ৪। মলিনা, বিশু, ডেভিড, বকুল, দানিয়েল, মুকুল, যোসেফ, বুলবুলি, নীলিমা, বুড়ি, শ্যামলী, অমর, জামাইবাবু, বাবু, চন্দন, মিঠু, চন্দনা, শিল্পী, মামনি ও পুটুন—কৃষ্ণনগর। মায়া, জন্নী, কেয়া, ছোড়দি, শিবু, শিপ্রা ও স্বপন ঘোষ—বাঁশদ্রোনী। মদন মোহন সামন্ত—বিজয়গড়, যাদবপুর। বিশ্বরূপ মুখার্জী, তাপস ধর, গৌতম আচার্য—কলকাতা ৬। শেলী, সীমা ও কাকু—বিরাটী। শঙ্কর ভট্টাচার্য—কলকাতা ৮। সত্যনারায়ণ, হরিনারায়ণ, গৌরী, তেতো বিশ্বাস, নীতা, কেয়া, সুরজিৎ, ভোলানাথ, জলি, মিঠু ও ডলিদ—রাণাঘাট সঙ্গীতা মুখার্জী—চন্দননগর। সুপ্রিয় দে (গ্রা, ১০৯৫)—কলকাতা ৩৬। সুনীল ও অনিল কুমার জৈন, সুনন্দ রায় মহাপাত্র—বেলদা। সুব্রত ও সৌমিত্র শূর—ওলাই-চন্ডীতলা, হুগলী। সুব্রত, মুক্তা, সিন্ধা, ও মা—কলকাতা ৩২। স্বাতী, বুড়ো, বিলু ও মাধুরী সরকার—ছামনা, বীরভূম।

ভেবে ভেবে সমাধান

সব সূত্রই সহজ নয়। না পারলে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। এটি তৈরি করেছেন দিগ্‌দর্শক

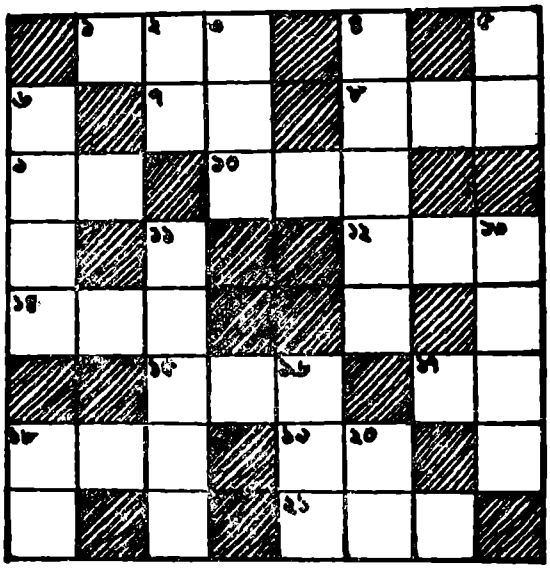

পাশাপাশি :

১ বিলিতি পাখী, ৭ মুখমণ্ডলে অবস্থিত, ৮ পড়ে যাচ্ছে এমন, ৯ বাংলার পাখি, ১০ রান্নার অবশ্য প্রয়োজনীয়, ১২ পিতা এবং প্রাচীন রাজা, ১৪ সংযোগ, ১৫ চিনি, ১৭ কচি নারকেল, ১৮ সমব্যথী, ১৯ সমস্ত, ২১ ভয়াবহ।

উপর-নীচ :

২ ছাড়া, ৩ আসলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ৪ নিজের লোক, ৫ থামা, ৬ হাসির গল্প লেখক, ১১ কার্তিক মাসের আলো, ১৩ শ্রেষ্ঠ কবি, ১৬ গাধা, ১৮ পাপড়ি, ২০ জাহাজকে বাঁধবার জন্য ভাসন্ত লোহার গোলক।

ভাদ্র মাসের 'ভেবে ভেবে সমাধান'-এর উত্তর

পাশাপাশি :

১ ভারত, ৭ বক, ৮ লালন, ৯ টালা, ১০ মালাই, ১২ কুখ্যাত, ১৪ মালপো, ১৫ লিনেট, ১৭ বাগ, ১৮ মালয়, ১৯ গম, ২১ রইনু।

উপর-নীচ :

২ রব, ৩ তকমা, ৪ কলাইকুন্ডা, ৫ পান, ৬ আটাকামা, ১১ নেপোলিয়ন, ১৩ তথাগত, ১৬ টগর, ১৮ মালা, ২০ মই।

নির্ভুল উত্তরদাতা :

অমিতাভ মজুমদার (গ্রা, ১২১৪)—নিউ দিল্লী ২৯। অতনু, অচিন্ত্য, প্রশান্ত, জয়ন্ত ও রমা ঘোষ, বিভাংশু দত্ত—আরামবাগ। কৃষ্ণা সরেন ও সুতপা ভট্টাচার্য—খন্যান, হুগলী। চামেলী ও বেলা চক্রবর্তী, সঙ্গীতা মুখার্জী—চন্দননগর। দীপালী, দীপক, সুনীল, অনুরাধা গুপ্ত, মা, বাবা ও মামা—হেতমপুর, বীরভূম। দেবাংশু ভৌমিক—রায়গঞ্জ। পঞ্চানন গুছাইত (গ্রা, ৬৯৪)—হাওড়া। পুনর্বসু ভট্টাচার্য—কলকাতা ২৯। বিশ্বরূপ ইন্দ্রানী, শোভা ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়—কলকাতা ৬। মনিদীপা ভট্টাচার্য (গ্রা, ১১৯৫)—সাতগাছি, দমদম। রেশমী মন্ডল, অতসী ও তাপস কাটারি, বাবা, মা, দাদা, দিদি, দাদু, ঠাকুমা, সন্ধ্যাদি—চাকুলিয়া, সিংভূম। শিব-সাধন সাধু—দক্ষিণবাজার, অন্ডাল। সৌমিত্র দত্ত (গ্রা, ১০৯৯)—ভবানীপুর, হাওড়া।

তিতুলের কাণ্ড

সম্পদ বসু

তিতুল ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার দিকে চেয়ে বলে উঠলো "স্টার্ট"। আর অমনি তিন ভাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া আরম্ভ করলো। বাবার কড়া আদেশ "রোজ অফিস থেকে ফিরে তোমাদের যেন পড়তে দেখি।" তাই ওরা বুদ্ধিটা বার করেছে। ড্রেসিং টেবিলটা এমন ভাবে রাখা রয়েছে যে ওটার দিকে বিশেষ একটা জায়গা থেকে তাকালে গলির মোড় অব্দি পরিস্কার দেখা যায়। আর তিতুল ঠিক ওই বিশেষ জায়গাটাতেই বসে। বাবার চেহারাটা আয়নায় দেখা দিলেই ওরা তিন ভাই– ইতুল, মিতুল আর তিতুল বেশ তোড়জোড় করে পড়াশোনা আরম্ভ করে দেয়। বাবা এসে দেখল সবাই পড়াশোনায় ব্যস্ত। ভাবেন, সত্যি, কি ভালো আমার ছেলেগুলো কেমন সুন্দর পড়াশোনা নিয়ে মেতে আছে।

তিতুল পড়ছিলো—আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন? এই লাইনটাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ছিলো তিতুল। আজ আবার বাবার মাইনে পাওয়ার দিন। এই দিনে বাবা কিছু না কিছু খাবার নিয়েই বাড়ি আসে। বাবার হাতে একটা প্যাকেটও দেখা গেছে কিন্তু ওটার মধ্যে কি আছে বোঝা গেল না। "আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন?" অমৃতি কিংবা কাঁচাগোল্লা হতে পারে, চমচম হলেও মন্দ হয় না, দানাদার হলেও চলবে। "আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন?" একবার বাবা সীতাভোগ নিয়ে এসেছিলেন, নাইস্ খেতে। যদি ছানার পোলাও হয়? আহা! তার মধ্যে যদি আবার ছোট ছোট রঙ্গীন রসগোল্লা টাইপের থাকে। "আমেরিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন?" আজকের প্যাকেটটা যেন একটু মোটা টাইপের। একখানা ঢাউস কেক্ নেইতো মধ্যে? কিংবা গরম ফুল কপির সিঙ্গাড়া হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো তিতুলের। মিতুল বলছে—কি সব পড়ছিসরে? আমেরিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন? লজ্জাপেল তিতুল অন্য মনস্ক থাকায় ভুল হয়ে গেছে, ভাগ্গিস্ বাবা শুনে ফেলেনি। ও বললো—দাদা, বাবা আজ কি আনলো দেখে আসবো? ইতুল চুপি চুপি বললো—আমরা জোরে জোরে পড়ছি, এই ফাঁকে তুই দেখে আয়।

রান্না ঘরে বাবা আর মা গল্প করছেন। অফিসের গল্প। মানে বাবার অফিসে এক সাহেব এসেছে আমাদের অঙ্ক মাষ্টারের মতো কড়া। তারই গল্প বলছেন বাবা। দরজার ফাঁক দিয়ে তিতুল দেখলো একটা নতুন আমুলের কৌটোয় মা কি একটা ঢেলে রাখছেন। জিনিসটা সাদা সাদা মতো। ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, ছানার মুড়কি হতে পারে, সীতাভোগ– না সীতাভোগ হবেনা কারণ ঢালার সঙ্গে সঙ্গে টিনের মধ্যে একটা শব্দ উঠছে। সীতাভোগ খুব নরম জিনিস, বরং ছানার মুড়কি হওয়ার চান্সই বেশী। তাছাড়া জয়নগরের মোয়াও হতে পারে। বাসের চাপা-চাপিতে ভেঙ্গেচুরে হয়তো ওই রকম হয়ে গেছে। আর একটা জিনিস হওয়া খুবই সম্ভব সেটা হলো চিনি মাখানো বাদাম। কৌটোয় শব্দটা খানিকটা ওই রকমই শোনাচ্ছে! অবশ্য নাখেয়ে সঠিক কিছু বলা হচ্ছেনা। এখন দেখতে হবে মা জিনিসটা কোথায় রাখে। তিতুল দেখল মা কৌটোটা হাতে করে এদিকেই আসছে। ও চট-করে সরে গিয়ে অন্য একটা দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। মা কৌটোটা হাতে করে ভাড়ার ঘরের ভেতর ঢুকল। তিতুল তাড়াতাড়ি ভাড়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দেখলো না কৌটোটা দেওয়াল আলমারীর একেবারে উঁচু তাকের ওপর রেখে দিলেন। মনে মনে হাসলো তিতুল। মা-খুব চালাক। প্রতি মাসেই মাইনে পেয়ে বাবা যখন কিছু কিনে আনে। খাবার সময় প্রতিবারই দেখা যায় যে হিসেবে কম হয়ে যাচ্ছে। দু চার খানা প্রতিবারই কেমন যেন ম্যাজিকের মতো উড়ে যায়। তাই বোধহয় এই সাবধানতা। সত্যি এই ঘরটায় যে খাবার জিনিস থাকতে পারে তা কারোর মাথাতেই আসবে না। তিতুল সোজা পড়ার ঘরে এসে পড়া শুরু করলো "আফ্রিকাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলা হয় কেন?" ঠিক তখনই বাবা ঢুকে পড়লেন, বললেন —কিরে তিতুল। তখন থেকে একটা লাইনই পড়ে চলেছিস এখনও আফ্রিকার অন্ধকার ঘোচাতে পারলি না?

রাত নটার সময় খাবার দেওয়া হবে। তার মধ্যেই কিছু একটা করা দরকার। বাবা এখন পুরোপুরি গুরু-মশাই। একটু আগে মিতুল আর তিতুলকে বকা ঝকা করে এখন ইতুলকে নিয়ে পড়েছেন। অঙ্ক নিয়ে খুব

হৈ চৈ চলছে। সময়টা তিতুলের পক্ষে বেশ উপযুক্ত বলে মনে হলো। ও অন্যমনস্ক ভাবে উঠে প্রথমে বাথরুমের দিকে গেল, তারপর ধীরে ধীরে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় এসে ঠেস দিয়ে দাড়ালো। মা রান্নাঘরে, বাসনপত্রের ঠন্ ঠন্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বাবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইতুলের মাথার মধ্যে কিছু বিদ্যে বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। সুতরাং ওদিকটা ঠিকই আছে। তিতুল কাঁধ দিয়ে আস্তে করে দরজাটা ঠেলতেই খুট করে ছোট্ট একটা শব্দ করে খুলে গেল। ঘরটা অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে সামনের দিকে এগোলো তিতুল। হাতে দেওয়াল ঠেকলো। এবার দেওয়াল ধরে ধরে খানিকটা বাঁ দিকে যেতেই আলমারীর কাঠের পাল্লায় হাত ঠেকলো। এই আলমারীটা সব সময়ই খোলা থাকে। অল্প একটু ঠেলা লাগতেই খুলে গেল সেটা। এবারই হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত কাজ। তাক বেয়ে ওপরে উঠে কৌটোটা অব্দি পৌঁছতে হবে। তিন নম্বর তাকে হাত রাখলো তিতুল, তারপর শক্ত করে সেটা ধরে সারা শরীরের ভার টেনে তুলে পা দুটো রাখলো দু নম্বর তাকের ওপর, তারপর চার নম্বর তাক ধরে ফেললো দু হাত দিয়ে। বেশ অসুবিধা, সোজাও হওয়া যাচ্ছে না আবার পুরোপুরি বসতেও পারা যাচ্ছেনা, অনেকটা ত্রিভঙ্গমুরারী টাইপের অবস্থা। একটা হাত খালি করে কৌটোটা নাবানোর চেষ্টা করলো তিতুল। অসম্ভব। প্রথমত সেটা বেশ ভারী তার ওপর ওটার সাইজ এমন বেখাপ্পা ধরণের যে একহাতে ঠিক মতো ধরাই যাচ্ছে না। ওই ভাবে ঝুলে ঝুলেই কৌটোটার ঢাকনা খুলে ফেললো তিতুল। ভেতরে হাত দিতেই হাতে ঠেকলো জিনিসগুলো। কি ধরণের খাবার আন্দাজ করতে পারলো না ও। কেমন যেন একটু তেল তেল মতো। কিন্তু আর দেরি করাও বিপজ্জনক। এক-মুঠো হাতে নিয়ে তিতুল মুখেপুরে ফেললো, আর তখনি একসঙ্গে অনেকগুলো জিনিস পরপর ঘটে গেল। প্রথমত ওর মুখের ভেতর একটা বিদঘুটে ধরণের বিস্বাদ আর বিচ্ছিরী অনুভূতি ওর ভেতরটা কেমন যেন গুবলেট করে দিল। ভেতর থেকে একটা বমির ভাব ছিট্‌কে বেরিয়ে এল। সেই মুহূর্তে ওর বাঁ হাতটা পিছলে গেল আর ডান হাত দিয়ে কিছু একটা ধরে ও নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়েও কৌটোটাকেই ধরে ফেললো। তারপর সব কিছু নিয়ে বিরাট একটা শব্দ করে মেঝের ওপর আছড়ে পড়লো। টিনটা পড়ে গিয়ে তার ভেতরের জিনিস-গুলো তিতুলের সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে খালি টিনটা ঘরের কোণের দিকে গড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা যে কি ঘটলো তিতুলের বুঝতে সময় লাগলো। কিন্তু ততক্ষণে সবাই ভাঁড়ার ঘরে ছুটে এসেছে। প্রথমেই ঢুকলেন মা। পটাশ করে আলোটা জ্বলে উঠলো। সুইচ্ থেকে হাত নামাতে নামাতে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও মা! সাবানের কৌটোটা পড়লো কি করে? একি!! তিতুল তুই, হায় ভগবান কি করে পড়লি? বাবাও ছুটে এলেন—সেকিরে, তুই এখানে কি করছিস? উঠে পড়লো তিতুল। মুখের মধ্যে তখনো গোটা পাচেক সাবানের কুচি। থু থু করে ফেলতে লাগল সেগুলো। মা আর বাবা দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। ইতুল আর মিতুল উঁকি মেরে পুরো ব্যাপারটা দেখে গেল। মা বললেন—ছিঃ ছিঃ, কোন দুঃখে তুই সাবান খেতে গেলি! তোদের জন্য তোর বাবা ভাল শাঁস সন্দেশ এনেছে, সে তো রান্না ঘরেই রয়েছে। আবার এক চোট হাসির ফোয়ারা ছুটলো।

মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তিতুল। ওর মনে তখন আর এক চিন্তা। আজতো যা হবার হলো, কাল যদি খবরটা ইতুল মিতুল মারফৎ স্কুলে পেঁছে যায় কি হবে তখন? চুপচাপ পড়ার টেবিলে এসে বসলো তিতুল। মিতুল তখন জোরে জোরে পড়ছে—"লোভ মানুষকে বুদ্ধি বিচার রহিত করিয়া তোলে"। এক একটা লাইনই বার বার পড়ছে মিতুল।

তুলোবুড়ি

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলোবুড়ি তুলোবুড়ি
কোথা যাও গুড়ি গুড়ি
একবার থমকে দাঁড়াও।
ছোট খোকা চেয়ে থাকে
কচি হাত তুলে ডাকে
কেন তুমি ধরা নাহি দাও?
বৈশাখে ওই শাখে
দোয়েল কোয়েল ডাকে
কত পাখি করে কিচিমিচি।
কি কাজ তে মার আছে
সব ফেলে কার কাছে
সারাদিন ছোটো মিছিমিছি?
একটুকু কাজ ফেলে
কানে কানে যাও বলে
কেন এত কর তাড়াঘড়ি।
বাতাসেতে ভর করি
তুলোবুড়ি তুলোবুড়ি
বহুদূর ভেসে যাও উড়ি।

পঞ্চু খুড়োর দেশত্যাগ

স্বপন মাখাল

কপাল ভালো পঞ্চু খুড়োর
ভাগ্য খানাও বটে
কিনলেন এক নধর ছাগল
ত্রিরিশ টাকায় মোটে।
দিন রাত্তির যত্ন করে
খাওয়ান পেটটি ভরে
আদর করে, সোহাগ করে
ছেলের মতন করে।
টসটসে সেই ছাগল ছানার
মস্ত গায়ের বল
পাড়া পড়শীর ঘুম ধরেনা
জিবের ডগায় জল——
বুঝতে পেরে পঞ্চুখুড়ো
নাকেতে দেন খত
দেশত্যাগী হবেন তিনি
দিলেন দস্তখত।

ব্যাঘ্র বৃত্তান্ত

প্রদীপ মজুমদার

সোঁদর বনের হোগলা ঝোঁপে
থাকত সে এক বাঘ,
বাবার সাথে ঝগড়া করে,
পালিয়ে গেল প্রাগ।
সেখানেতে সবাই বলে
কে তুই ? পালা, ভাগ
ব্যাঘ্র-মশাই দেশে ফেরেন
করে ভীষণ রাগ।
বেতিয়ে তারে লম্বা করে
তাহার বাবা টাগ,
বাঘের গায়ে তাইতো দেখি,
কালশিটেরই দাগ।

॥ শুধু তোমাদের জন্যে ॥

প্রায়-ই শুনি যে অনেক আশা নিয়ে যে সব গাছ তোমরা লাগাচ্ছ, সেগুলো অন্যদের অবহেলায় মারা পড়ছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে খুবই দুঃখজনক। তবে এই সমস্যার আর একটা দিকও আছে। সেটা হল চোখ খুলে দেবার দিক। এর ফলে কলকাতার সমস্যাগুলো যে কত বেশী জটিল সে বিষয়ে অবগত হওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ। শুধু অবগতির জন্যই, শুধুমাত্র 'কলকাতা-উন্নয়ন' এই শব্দ দুটোর মানে যে কী ভয়ংকর সেটা জানার জন্যই কলকাতার মাটিতে একটা করে গাছ পোঁতার দরকার রয়েছে তোমাদের। শুধু তোমাদেরই, ছোটদেরই বলছি এই কথাগুলো কারণ বড়রা তো শুধু সমালোচনা, শুধু "কলকাতাটার আর কিস্সু হবে না" বলেই খালাস। কিন্তু যে শহরে আজ একটা গাছ পুঁতলে কাল সকালে উঠে সেটা জ্যান্ত পাওয়া যায় না, সে শহরের রাস্তাঘাট, জলসরবরাহ, বস্তী ও এলাকা উন্নয়ন, পরিবেশ দূষণরোধ করা, মোট কথা শহরটাকে বাঁচানোর কাজ যে কী কঠিন সেটা অন্তত তোমরা হৃদয়ঙ্গম করবে। আর তোমাদের নিজেদের শহরটা তোমাদের আন্তরিক সমবেদনা ও সহযোগিতা আরও বেশী করে পাবে।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

রামলগনের রামছাগল

সঞ্জীবকুমার দে

রামলগনের রামছাগলের
লম্বা পাকা দাড়ি ;
সুযোগ পেলেই যখন তখন
পালায় ছেড়ে বাড়ি।
রামলগনের রামছাগলের
লম্বা সরু ঠ্যাং ;
ঘেঁষলে পরে সামনে যে তার
মারবে কষে ল্যাং।
রামলগনের রামছাগলের
বিরাট দু'টি কান ;
রাত-বিরেতে মাঝে মাঝেই
গেয়ে ওঠে গান।
রামলগনের রামছাগলের
শিং দু'খানি খাসা ;
তাই দিয়ে ঢুঁ মারবে তেড়ে,
দেখতে পেলেই মশা।

বলো তো ?

নীচে তিনজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের নামের পাশে তিনটি করে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম দেওয়া হল। ঐ সাহিত্যিকের সঠিক ছদ্মনাম কোনটা লিখে জানাও। তবে তাড়াতাড়ি। তিনটিরই সঠিক উত্তরদাতাদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। এতে অবশ্য তোমরা যারা সব সাহিত্যিকের ছদ্মনাম কি জান না, তারা জানতে পারবে। উত্তর পত্রের ওপরে 'বলো তো ;' কথাটি লিখবে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পত্রনবীশ/
আন্নাকালী পাকড়াশী/হরিদাস বৈরাগী।
২। রাজশেখর বসু—পরশুরাম/
শ্রী শ্রীকান্ত শর্মা/কালপুরুষ।
৩। শক্তিপদ রাজগুরু—পঞ্চমুখ/
অনিরুদ্ধ/কৌটিল্য।

চৈতী সাহিত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছড়া দুটি এবং প্রথম হইতে দশম স্থানাধিকারীদের নাম প্রকাশ করা হল। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানাধিকারীদের ছড়াও প্রকাশ করা হবে।

প্রথম : রানী দত্ত
৩৮৮ বাঁশদ্রোনী পার্ক, ২৪ পরগণা।
দ্বিতীয় : দেবপ্রতিম সেনগুপ্ত
৬০এ, ভিকটোরিয়া রোড, দার্জিলিং।
তৃতীয় : শিবনারায়ণ বসু
পূর্বসাতরাপাড়া, রহড়া।
চতুর্থ : সুখেন্দু মজুমদার
রাধাগোবিন্দ পল্লী, সোনারপুর।
পঞ্চম : দৈবযানী দেবনাথ
৫৪।১।৭ কাঁকড়াপাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি।
ষষ্ঠ : অমিত মুখার্জী
৭সি, আরপুলিলেন, কলকাতা ১২।
সপ্তম : তরুণকান্তি বারিক
৬৪ মনসাতলা লেন, কলকাতা ২৩।
অষ্টম : শর্মিলা রায়
নয়নকানন, বারাসত।
নবম : রায়হান আলি খান
দানেশ শেখ লেন, হাওড়া।
দশম : চামেলী চক্রবর্তী
সাহেববাগান, চন্দননগর।

ভাদ্র মাসের 'বলো তো ?'-র উত্তর

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ভীষ্মদেব খোসনবীশ।
২। প্রেমেন্দ্র মিত্র—কৃত্তিবাস ভদ্র।
৩। কবিতা সিংহ—সুলতানা চৌধুরী।

নির্ভুল উত্তরদাতা :

অনিমা, যোগমায়া ও বাবু মিত্র—চন্ডীতলা, হুগলী।
দিলীপকুমার চৌধুরী—জামশেদপুর।
দিলীপকুমার ঘোষ ও ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়—কলি-৬।
বুবাই, বুলাই ও বুকাই দেব—কলকাতা ৫।

অনিলকুমার করাতি কর্তৃক ৩৮বি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত ও
ফাইন প্রিন্টিং হাউস, ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

সাক্‌সেস্‌ পাবলিশিং হাউস

১, বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০৭৩

সহৃদয় প্রধান শিক্ষক ও সহ শিক্ষক বন্ধুগণ,

আশা করি আপনাদের সকলেরই মঙ্গল সংবাদ। আপনারা আমার প্রীতি ও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

১৯৮০ সালের বাৎসরিক পরীক্ষার (দুই প্রস্থ) প্রশ্নপত্র আগামী ৯ই নভেম্বর হতে সরবরাহ পাবেন। ঐ সঙ্গে ১৯৮১-র নূতন বই এর পাঠ্যতালিকা ও নমুনা বই পাবেন। ১৯৮১তে সিলেবাসের কোন রদ বদল হচ্ছে না। পত্র না গেলেও জানবেন বছরে আমাদের ৪ বার (এপ্রিল, জুন, আগষ্ট, নভেম্বর) প্রশ্নপত্র বের হয়।

এই বছর কাগজের দাম ও মুদ্রণ খরচ অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে, তথাপি আমার প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্র এবং পুস্তকের মূল্য বাড়ছে না। গত বৎসরের ন্যায় থাকছে।

বিশেষ কথা—জেলা, সার্কেল, অঞ্চল প্রভৃতি শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা প্রশ্নপত্র ক্রয় করার এবং পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করার পূর্বাহ্নে আমার সাথে যোগাযোগ করুন। সমিতির সহিত পুরাপুরি সহযোগিতা নিঃসঙ্কোচ করতে আমার প্রতিষ্ঠান আগ্রহশীল।

প্রশ্নপত্রের রেট—২য় (বড়) ইতিহাস সহ, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী প্রতি সেট টা ১·৪০, ১ম শ্রেণী ৭০পঃ, শিশুশ্রেণী ৫০পঃ, ১ম শ্রেণীর কেবল ইংরাজী ৪০ পঃ। ২য় শ্রেণীর ছোট প্রশ্নপত্র ১·২০ টাকা, কমিশন টাকায় ৬০ পয়সা। ৫ম শ্রেণীর প্রতি সেট নেট ৬০ পঃ। নামছাপা স্কুল প্রতি ৪ টাকা।

বিঃ দ্রঃ হাতে বা ডাকে কমিশন বাদ ৩১ টাকার উপর প্রশ্নপত্র নিলে নামীদামী লেখক লেখিকার লেখায় ভরপুর ৪০০ পাতার বোর্ড বাঁধাই পক্ষিরাজ, ৪১ টাকার প্রশ্নপত্র নিলে একটি **English to Bengali Pocket Dictionary** ৯০০ পাতার বই, ৬০ টাকার প্রশ্নপত্র নিলে একটি **English to Bengali (বড়) Dictionary** ১৫০০ পাতার বই উপহার হিসাবে পাবেন। এই ক্ষেত্রে ডাক ব্যয় আপনার এবং অর্দ্ধেক টাকা **M. O.** যোগে অগ্রিম পাঠাতেই হবে। ইতি—তাং ৬। ১১। ৮০

নিবেদক—শ্রী মনোহর করাতি

আগামী সংখ্যায় ১৯৮১ সালের সাহায্যকারী পুস্তকের তালিকা (শিশু থেকে চতুর্থ শ্রেণী) দেখতে পাবেন।

প্রাইমারী বাংলা সমস্ত রকমের খাতাপত্র পাবেন। কমিশন ১০%।

PAKSHIRAJ Regd. No. WB/EC 165 RN. No. 32844/78 Re. 1·00

এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার

ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই

ভারী মজার। এই একটা
উপহার আমাকে বছর বছর
উপহার এনে দেবে। ইউকোব্যাঙ্ক
পাস বইয়ের মজাই তো ঐখানে।

ভাগ্যিস্, মার মাথায় বুদ্ধিটা
এসেছিল। অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও
ধন্যবাদ দিই—আমার জমা পয়সা
বছর বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমাও